প্রসঙ্গ : শিবনাথ শাস্ত্রী

প্রসঙ্গ : শিবনাথ শাস্ত্রী

ড. বারিদবরণ ঘোষ

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

Prasanga : Sivanath Sastri
a collection of essays on Pandit Sivanath Sastri
by Dr. Baridbaran Ghosh

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৭। জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গ বাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা ৬

শক্তিমান কথাসাহিত্যিক

শ্রীসুভাষচন্দ্র ঘোষ

অগ্রজোপমেষু

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে যাঁরা জানেন তাঁদের অনেকেই তাঁকে জানেন ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা হিসাবে। কিন্তু এই সামাজিক-সাহিত্যিক-দেশপ্রেমিক মানুষটিকে পুরোপুরি জানার সুযোগ আমাদের কম এসেছে। এই বইয়ের প্রবন্ধ-দশকে শিবনাথের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। যে সত্যনিষ্ঠা তাঁর জীবনকে প্রতিমুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করেছে, পাঠকেরা তার কিছু স্পর্শ পেলেই এই গ্রন্থপ্রকাশ সার্থক হবে।

প্রবন্ধগুলি অমৃত, আনন্দবাজার, আলেখ্য, উত্তরসূরি, তত্ত্বকৌমুদী ও সমীক্ষা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সুযোগে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তেই সাহিত্যালোকের কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ বইটি সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল দাস, ড° অতুল সুর—এঁদের প্রবর্তনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বইটির নামকরণ করেছেন আমার স্ত্রী সুব্রতা ঘোষ। কন্যা দুটি—সুতনুকা ও সুবর্ণা—এ বই দেখলে সবচেয়ে খুশি হবে।

এ যুগে যে সত্যনিষ্ঠ মানুষটি বই প্রকাশের জন্য আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিয়ে যান, তাঁকেই বইটি উৎসর্গ করে নিজেকে বাধিত বোধ করছি।

রোজভিলা, বর্ধমান
713101

বারিদবরণ ঘোষ

পাঠ-সূচী

দুই ব্যক্তিত্ব : শিবনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ্যে পরিচয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা হিসাবে। এই সূত্রেই তিনি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর (ভট্টাচার্য) জন্ম ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ দুজনের বয়সের ব্যবধান প্রায় চৌদ্দ বছরের। শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের আট বছর বয়সে। তার বেশ কিছুকাল আগেই ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলী শুনেছিলেন। এবং প্রধানত দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলী পাঠ করেই ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত ব্যাপারে আকর্ষণ অনুভব করেন। অন্য আরও একটা কারণ অবশ্য সক্রিয় ছিল। তাঁর স্বগ্রাম মজিলপুর নিবাসী জ্ঞাতিভ্রাতা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত (আদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ) ব্রাহ্ম এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক। ইনিই প্রত্যক্ষভাবে শিবনাথকে ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করেন। শিবনাথ-জনক হরানন্দ ভট্টাচার্য গোঁড়া ব্রাহ্মণ হলেও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। পরবর্তীকালে মহর্ষিদেবের সঙ্গে পণ্ডিত শাস্ত্রীর গভীর সৌহার্দ্য জন্মে। শিবনাথ তাঁর 'Men I have seen' গ্রন্থে, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দৃষ্টান্ত' ও উপদেশ, এবং 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' পুস্তিকাদ্বয়ে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিক অনুভূতি মনোরমভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা যায়। আপাতত যা এ-প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিবনাথের পরিচয়ের আদিপর্বের বিস্তৃত বিবরণ অবশ্য পাওয়া যায় না। তবে ঠাকুর পরিবারে গতায়াতের সূত্রে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে দেখা শিবনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। ১লা মাঘ ১৮০৬ শক (১৮৮৪ খ্রী) সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখতে পাচ্ছি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চপঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের নোটিশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এখন তেইশ বছরের যুবক। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

অন্যতম কর্ণধার শিবনাথ শাস্ত্রী নিশ্চয়ই জানতেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর প্রথম বয়সে ধর্মের জন্য ততখানি সুপরিচিত ছিলেন না, যতখানি ছিলেন তাঁর সুকণ্ঠের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি চমৎকার প্রবন্ধের বিষয়, আমি আপাতত সেটিকেও আলোচনাভুক্ত করছি না। আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গঠনগত ও নীতিগত পার্থক্য অবশ্যই বর্তমান ছিল। কিন্তু এই পার্থক্য দেবেন্দ্রনাথ ও শিবনাথের মধ্যে সহজ ও গভীর সম্পর্ক রচনায় কিছু-মাত্র বাধা সৃষ্টি করেনি। তাঁদের অন্তরের এই সম্মিলনকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

'আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাঁহার সুরের মিল ছিল। মতের মিল থাকিলে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হয় ভক্তি হয়, সুরের মিল থাকিলে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটে।···

···আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অনুধাবনেই পিতৃদেব সমস্ত কঠিন বাধা ভেদ করিয়া অসীমের অভিমুখে জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমগ্র জীবনের সহজ ব্যাকুলতার স্বভাবটি শিবনাথ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার নিজের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার এই সহজ বোধটি ছিল।'

আমিও এখানে ব্যক্তিসম্পর্কটিকেই বড়ো করে দেখেছি, প্রতিষ্ঠানের আদর্শের বিচারে নয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শিবনাথের সশ্রদ্ধ মনোভাবের প্রথম উল্লেখ পাই সিটি কলেজে রবীন্দ্রনাথের ১৭ জানুয়ারি ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত রাজা রামমোহন রায় প্রবন্ধ প্রসঙ্গে। এই প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকার মাঘ ১২৯১ সংখ্যায় (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি নিয়ে সুদীর্ঘ মতামত প্রকাশ করেন তাঁর একটি বক্তৃতায়। 'রবীন্দ্রবাবুর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি বর্তমান মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে' একথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যে রামমোহনের চরিত্রালোচনা সম্পর্কে এযাবৎ প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তা ঘোষণা করেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘ প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচারের নিমিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে আপন অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'চারিত্র-পূজা' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি উদ্ধারের সময় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মূলপ্রবন্ধের অনেকাংশ বাদ দেন। শিবনাথ এই মতবাদকে এই দিনের সভায় পূর্ণ সমর্থন জানান।

রবীন্দ্রনাথও শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি সমভাবের সম্মান প্রদর্শন করেছেন তাঁর বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনাকালে। জমিদারী পরিদর্শনান্তে শিলাইদহে ফিরে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভার জন্য (১৩ শ্রাবণ ১৩০৫) ভাষণ রচনা করেন। এই ভাষণ রচনার অব্যবহিতপূর্বে 'প্রদীপ' পত্রিকায় (আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০৫ সংখ্যায়) শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' শীর্ষক চমৎকার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় (প্রবন্ধটি পরে 'শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধাবলী' ও 'সাহিত্য-রত্নাবলী' গ্রন্থদ্বয়ে গৃহীত হয়েছিল)। প্রবন্ধটি পড়ে পাঠকের উচ্ছ্বসিত আনন্দে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সংখ্যায় (পৃ. ৭৬৪) মন্তব্য করেছিলেন :

'বাঙ্গালা সাময়িকপত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর মত প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রচুর ভাব সম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।'

শুধু পত্রিকায় নয়, পত্রেও এই মন্তব্য সমান গুরুত্বে মুদ্রিত। প্রবন্ধ পাঠে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ স্বতোপ্রণোদিত হয়ে ৮ শ্রাবণ ১৩০৫ তারিখে শিলাইদহ থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন :

'বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।'

পত্রে এবং পত্রিকায় মাত্র নয়, আপন ভাষণ মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের চিত্তের এই উদারস্বীকৃতি আশ্চর্য স্বচ্ছতায় মুদ্রিত। ১৩ শ্রাবণ ১৩০৫ সালে প্রদত্ত এই ভাষণের (চারিত্রপূজা গ্রন্থের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বিদ্যাসাগর-চরিত'-এর সূচনাংশ দ্রষ্টব্য) সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন :

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সে প্রকৃত-রূপে জীবিত যে মনের দ্বারা জীবিত থাকে।'

বঙ্গসাহিত্যে শিবনাথের দানের প্রসঙ্গ যাঁরা জানেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ শক্তির গভীরতার কথাও জানেন। প্রসঙ্গত, পত্রের প্রথমাংশে 'আত্মচরিত' রচনা-প্রস্তাবের 'প্রত্যাখ্যান'-এর যে প্রসঙ্গ রয়েছে, সে সম্পর্কে নিবেদনযোগ্য যে, শিবনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এসময়ে আত্মজীবনী রচনা না করলেও পরে করেন। লাবণ্যপ্রভা বসুর অনুরোধে রচিত শিবনাথের এই 'আত্মচরিত' (১৯১৮ খ্রী) বাংলা চরিতসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। চিঠিটি থেকে এ-ও অনুমিত হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ শিবনাথকে সম্ভবত 'আত্মচরিত' রচনার প্রস্তাব জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং শিবনাথও তদুত্তরে কিছু লিখেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই পত্রাবলী আমাদের হস্তগত হয়নি ; এমন কত মূল্যবান্ জিনিসই তো ক্রমাগত আমরা হারিয়ে চলেছি।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত চিঠির আরও একটি প্রসঙ্গ এখানে বিশেষভাবে আলোচিতব্য। রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গসাহিত্যে শিবনাথের অধিকারের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন, এটা কোনো উচ্ছ্বাস নয়। এই পত্র রচনার চার বছর আগে ৬ই জানুয়ারি ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে (১৩০১ বঙ্গাব্দে) শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত প্রখ্যাত উপন্যাস 'যুগান্তর' মুদ্রিতাকারে আত্মপ্রকাশ করে। 'সাধনা' পত্রিকার চৈত্র ১৩০১ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এর একটি অভূতপূর্ব সমালোচনা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে এটি মুদ্রিত আকারে আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে আছে। গঠনমূলাত্মক এই সমালোচনার আদিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'শিবনাথবাবুর যুগান্তর উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে কর্তব্যক্লান্ত সমালোচকের চিত্ত বহুকাল পরে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।'

রবীন্দ্র-শিবনাথের এই সাহিত্যিক সৌহার্দ্যের সূত্রেই 'মুকুল' নামক শিশু পত্রিকার সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কবিতা প্রার্থনা করেছিলেন। সেই মতো 'মুকুল' পত্রিকার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩০২ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের 'কাগজের নৌকা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-শিবনাথের সংযোগের আরও একটি নিদর্শন আমার

হাতের কাছে রয়েছে। এটি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। এটি হ'ল শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি (অপ্রকাশিত এই পত্রটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে মুদ্রিত)। চিঠিটি নিম্নরূপ :

কলিকাতা ২২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
১১ই এপ্রিল ১৮৯৯

সপ্রেমসম্ভাষণপূর্বক—

অদ্যকার ডাকে আপনার নিকট "নয়ন-তারা" নামে নব প্রকাশিত একখানি পুস্তক প্রেরিত হইল। যাহার যাহা বাতিক তাহা কোথায় যায়। কিন্তু পুস্তকখানি কিরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। শেষটা এইভাবে করা হইয়াছে যে ভবিষ্যতে অপরার্ধ আর এক পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইতে পারে। আর যদি তাহা না হয়, এইখানেই শেষ। পুস্তকখানি আপনার বিচারের জন্য প্রেরিত হইল। অপক্ষপাতে বিচার করিয়া যেরূপ ভাল বোধ হয় করিবেন। বাহির করিয়া আমার মনে হইতেছে, এরূপে শেষ না করিয়া মিলন করিয়া দিলেই হইত। যাহা হউক, পুস্তকটির উদ্দেশ্য এই, (১ম) Culture ও accomplishments-তে Woman-কে unwomanly করে না, এই দেখান—(২য়) পারিবারিক সুখের একটা ছবি লোকের নিকট ধরা। আমার এখন ভয় হইতেছে, যে এ দুইটাই এদেশের লোকের প্রচলিত ভাবের এত বিরোধী যে লোকে পছন্দ করিবে না।

কেহ কেহ বলিতেছেন বিলাতফেরতদিগকে অযথা তিরস্কার করা হইয়াছে। প্রতীচ্য সভ্যতার যে দোষগুলি তাঁহারা আনিতে চান—তাহারই প্রতিবাদ আছে।

যাহা হউক আপনার মতামত জানাইবেন। মতটা প্রকাশ করিবার পূর্বে আমাকে জানিতে দিবেন। ইতি

প্রেমানুগত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

'নয়নতারা' শিবনাথের তৃতীয় উপন্যাস এবং ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। পূর্ববর্তী উপন্যাস 'যুগান্তর'-এর গঠনাত্মক সমালোচনা শিবনাথকে এই উপন্যাস রচনায় অনেক শিল্পিতস্বভাবসম্পন্ন করে তুলেছিল। যেকারণেই পুনশ্চ এই উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানার জন্য শিবনাথের মনে স্বভাবতই আগ্রহ জেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই পত্রের কোনো জবাব দিয়েছিলেন কিনা অথবা 'নয়নতারা' সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেছিলেন কিনা, এখনও তা জানার সুযোগ বা উপাদান আমাদের হাতে নেই।

৩

সাহিত্য প্রসঙ্গ ছাড়াও ব্রাহ্ম-সমাজ সম্পর্কিত কিছু কিছু ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ও শিবনাথ সন্নিকটস্থ হয়েছিলেন। এসব ঘটনার দু-একটি নিদর্শনের এখানে উল্লেখ করি।

১৮০৭ শকাব্দের (১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের) চৈত্র মাসে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং অন্যান্য কিছু ব্রাহ্মবন্ধু কোন্নগরে যান। এদিন রবীন্দ্রনাথও ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা' এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আরও লিখেছেন :

'সুকবি ও গায়ক শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন্নগর উৎসবে মধুর সঙ্গীতে উপাসকদিগের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

আমরা অতীব আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, রবীন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের উপাসনালয়ে আগমন করিয়া মধুর সঙ্গীত দ্বারা উপাসকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, এবং অবসর থাকিলেই সমাজের সাপ্তাহিক সায়ংকালীন উপাসনায় সঙ্গীত করিবেন বলিয়াছেন।'

৭ই পৌষ ১২৯৮ (২২ ডিসেম্বর ১৮৯১) তারিখে শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা-পত্র পাঠের দ্বারা মন্দির দ্বার উন্মোচন করেন। এরপর উপাসনার বেদী গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও আশ্রমধারী অচ্যুতানন্দ স্বামী। দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠিয়েছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে শিবনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতাদির দ্বারা উপস্থিত পঞ্চজনকে আনন্দ দান করেন।

প্রধানত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের উদ্যোগে জনসেবার আদর্শ সমাজ মধ্যে প্রচার ও জনসমাজের হিতসাধনের জন্য ১২ মাঘ ১৩২১ (২৬ জানুয়ারি ১৯১৫) বঙ্গাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সভা আহ্বানের পর বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী গঠিত হয়। ১লা ফাল্গুন ১৩২১ তারিখে এই মণ্ডলীর যে প্রারম্ভিক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আহূত হয় তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। এদিন রবীন্দ্রনাথ 'কর্মযজ্ঞ' শীর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। পরবর্তী ১৪ চৈত্র ১৩২১ তারিখে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সভ্যগণের সাধারণ সভায় সহ-সভাপতি হিসাবে অন্যান্যদের সঙ্গে শিবনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নির্বাচিত হন। সভাপতি হন বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ মহতাব।

৪

শিবনাথ-রবীন্দ্রনাথের সংযোগের আরও একটি মূল্যবান দলিল আমাদের হাতের কাছে রয়েছে। সেটি স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রাণতা বহু-বিদিত সংবাদ। শিবনাথও উচ্চশ্রেণীর স্বদেশ সাধক ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে স্বদেশচর্চার দীক্ষাগুরু বলেছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। ইংরেজ সরকারের কার্লাইল সার্কুলারে ছাত্রদলন যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মাচার্য শিবনাথ স্বদেশের জন্য প্রয়োজনে এক বছরের জন্য পড়াশুনা স্থগিত রাখার আহ্বান জানালেন। ছাত্র-সমাজে শিবনাথের প্রভাব এতো সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এই দেশের তাকে কয়েকজন পি. আর. এস. ও এম. এ. পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উপস্থিত না হবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ শিবনাথের এই পরিচয় জানতেন। সেকারণে জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার্থে তিনি এ সময়ে যে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন, সেই উপলক্ষে শিব-নাথকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন। শিবনাথ এ সময়ে স্বাস্থ্যের কারণে দূর দার্জিলিং-এ বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিবনাথের কলকাতার ঠিকানায় রাখীবন্ধন উৎ-সবের অভিজ্ঞানস্বরূপ একটি রাখী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাখী পুনঃপ্রেরিত হয়ে শিবনাথের কাছে দার্জিলিং-এ পৌঁছলে দূরবাসী শিবনাথের হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর তারিখে লিখিত শিবনাথের পত্রটিতে এই মনোভাব সুন্দররূপে মুদ্রিত আছে। শিবনাথ লিখেছেন :

Ray Villa, Darjeeling
19th October 1905

প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে—

আপনার প্রেরিত 'রাখী' কলিকাতা আশ্রম হইতে পুন প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছে। আপনি যে এত ব্যস্ততার মধ্যে এমন দিনে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সাদরে রাখিগাছি ধারণ করিয়াছি। ঈশ্বর করুন আপনারা যে জীবন জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহার কিছু স্থায়ী ফল ফলে। বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র সম্মুখে। ইতি

প্রেমানুগত
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

৫

রবীন্দ্রনাথ এবং শিবনাথের একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা এবারে সানন্দে উল্লেখ করি। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরীতে একটি ছোট সভা বসে। বিজ্ঞাপন নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, এ সংবাদ লোকমুখে প্রচার হওয়া মাত্রই ভীড় জমে যায় অপরিসীম। তেমনি ভীড় জমে গেছে। সভাপতি শিবনাথ শাস্ত্রী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত আছেন, রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন নোবেল প্রাইজ পুরস্কারপ্রাপ্তি ও স্বদেশবাসীর সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে। বক্তৃতার শেষে গান হল—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'। গান শেষ হল একসময়। সাতষট্টি বছরের পক্বকেশ শুভ্রশ্মশ্রু সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। পাশেই বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বের বরমাল্যে জ্যোতিষ্মান। শিবনাথ রবীন্দ্রনাথের কেশস্পর্শ করে উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ জানালেন কবির এই বহু সম্মানে। আহ্বান করলেন জনমণ্ডলীকে উঠে দাঁড়িয়ে কবিবরকে প্রত্যভিবাদন করতে। জনমণ্ডলী উঠে দাঁড়িয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে একযোগে কবিসম্রাটকে সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। এ এক অপূর্ব অন্তরঙ্গ স্বীকৃতি।

৬

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর দেহাবসান ঘটে। পরবর্তী অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ 'শিবনাথ শাস্ত্রী' নামে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করে শিবনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শিবনাথের যোগের মূল সূত্রটি নিরূপণ করেছেন। সংস্কারের ঊর্ধ্বে শিবনাথের যে জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল তার ধর্মগত উপলব্ধিটি অতঃপর ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল মন্তব্য : 'আত্মার প্রাণশক্তি সহজ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ বাঁধায় নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন।'

শিবনাথ শাস্ত্রীর অপর যে চারিত্রিকগুণটি রবীন্দ্রনাথকে অধিকতর আকর্ষণ করেছিল, 'সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা।' মানুষকে শিবনাথ ভালবাসতেন 'সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি'—দুই দিয়েই। তৃতীয় যে গুণে শিবনাথ রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিলেন তাহল শিবনাথের প্রবল 'সত্যনিষ্ঠা'। সে-

কারণে 'তাঁর প্রবল মানববাৎসল্য থাকা সত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই।'

এই প্রবন্ধের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন, এবার সেটি উদ্ধার করি। 'শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে আমি যেটুকু চিনিতাম, সে আমার পিতার সহিত তাঁহার যোগের মধ্য দিয়া।' শিবনাথের মনোজীবনের যে অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে শিবনাথের পরিচয় 'ঘনিষ্ঠ' ছিল না একথা ভাবা শক্ত। বিভিন্ন সূত্রে তিনি শিবনাথের সংস্পর্শে এসেছেন। বয়োপার্থক্য রবীন্দ্রনাথের কাছে 'ঘনিষ্ঠ' হবার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি কখনও। ঋষি রাজনারায়ণ বসু এবং কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী দুজনেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরের জন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বয়সের গণিতভ্য ব্যবধান সত্বেও।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি সন্দিগ্ধ মানুষের মনকে গভীর অস্বস্তিতে ভরিয়ে তোলে। শিবনাথের 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথের একবার মাত্র উল্লেখ দেখে স্বভাবতই কেমন অস্বস্তি লাগে। তাঁর The History of Brahmo Samaj-এ আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ একাধিকবার আছে বটে, কিন্তু অন্য কোথাও তাঁর নাম দেখি না। শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী আমি তন্ন তন্ন করে দেখেছি, কিন্তু কোথাও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ তেমন পাইনি।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে একদল রবীন্দ্রানুরাগী যখন স্পেশাল ট্রেনে চড়ে শান্তিনিকেতনে কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে যান, তখন তাঁদের আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ভাষণ সমাগত অতিথিবৃন্দকে তুষ্ট করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রধান অভিযোগ ছিল, বিদেশ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আগে স্বদেশবাসীর সম্মানে তিনি ভূষিত হননি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র সম্মানিত সদস্য করলেও এনিয়ে আবর্তও কম সৃষ্টি হয়নি। এইসব নানা অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিবনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-সূচক 'ঘনিষ্ঠতা'র মন্তব্যটিকে ভেবে দেখার অবকাশ বোধকরি এখনও বর্তমান।

শিবনাথ শাস্ত্রী ও বঙ্কিমচন্দ্র

এই প্রবন্ধটি রচনার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ও শিবনাথ (১৮৪৭-১৯১৯) উভয়েই সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা শিবনাথের চেয়ে বহুগুণে অধিক। কিন্তু উভয়ে প্রায় সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মিলন ঘটেনি। ঘটনাটি স্বভাবতই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রসংগত বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। বঙ্গদর্শনের পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে তার পরিচয় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের চোখে এড়াবে না। বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গ উভয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল।[১]

শিবনাথের ক্ষেত্রেও মনে হতে পারে যে, অন্তত ধর্মগত বিভেদই হয়তো বঙ্কিম ও শিবনাথকে সাহিত্যের একাসনে মিলিত হতে দেয় নি। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বঙ্কিম যদি সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হতেন, তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা রামমোহনের প্রামাণ্য জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত রামমোহন জীবনীর আলোচনা বিস্তৃতভাবে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় স্থান পেত না।[২] অথচ শিবনাথের কোন উল্লেখই বঙ্গদর্শনে লক্ষ্য করি না।

সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন আর শিবনাথ তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল প্রথমে। পরে সম্ভবত মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার কথা ভেবেই ঈশ্বর গুপ্তের পরামর্শে তিনি গদ্যরচনায় মনোযোগী হন ও কালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে পরিগণিত হন। শিবনাথ ভট্টাচার্যও বাল্যকাল থেকেই গভীর আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পাঠ করতেন।[৩]

শিবনাথ প্রধানত কবি বলে পরিচয় লাভ করলেও গদ্যরচনায় তাঁর প্রতিষ্ঠাও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু বঙ্কিম ও শিবনাথ উভয়ে একত্রে এলেন না। তবে কী উভয়ের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য উপস্থিত হয়েছিল ? হয়েছিল এবং তার কারণটি নিরূপণ করার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নবীনচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়ে সমবয়সী ছিলেন—উভয়েরই জন্মকাল ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ। নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভাকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের অবদানের কথা নবীনচন্দ্র কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছিলেন। নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে শিবনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে বলেন, বঙ্গদর্শন পুন প্রচারিত করার প্রস্তাব উঠলে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তার সম্পাদক হতে চাইলেন না, তখন ঠিক হল সঞ্জীববাবু সম্পাদক কার্যাধ্যক্ষ উভয়ই হবেন। 'তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতে দিবে না বল।" আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম।'[৪]

আমরা সবিস্ময়ে জ্ঞাত হলাম যে, বঙ্কিমের এমনতর প্রতিজ্ঞার কারণ একটি প্যারোডি। বঙ্কিমের 'সুন্দরী সুন্দর' নামক কবিতার একটি প্যারোডি রচনা করেছিলেন শিবনাথ। প্যারোডিতে বঙ্কিমের 'কেন না হইলি তুই, যমুনার জল, রে প্রাণবল্লভ'![৫] রসিক শিবনাথের রসের পাকে 'কেন না হইনু আমি মাছের ধুচুনিরে' ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হয়েছিল।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটি সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল সপ্রশংস উক্তি করছেন—'তাহাতে তাঁহার উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা ও বিদ্রূপশক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।'[৬] এমনকি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি তার কাব্যরসে 'মুগ্ধ' হয়ে গিয়েছিলেন। জানি না শুধুমাত্র প্যারোডি হিসাবে কবিতার সার্থকতার কথা বঙ্কিম বলেছিলেন কি না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, কবিতাটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'মুগ্ধ' হওয়ার পরিবর্তে ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন "বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরলভাবে) করিয়াছিল।"

নবীনচন্দ্রের অনেক মন্তব্যের প্রতি আধুনিক কালের সমালোচকগণের একাংশ নানা সংশয় প্রকাশ ক'রে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেরূপ, কোন সংশয়ের কারণ দেখি না। কারণ একথা সত্য যে, 'বঙ্গদর্শন'-এ শিবনাথ কখনও লেখেন নি, তাঁর নামোল্লেখ নেই, এমন কি বঙ্গদর্শনের পুস্তকসমালোচনা বিভাগে শিবনাথের কোন বই-এর সমালোচনা পর্যন্ত নেই। অথচ 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮)-এর কবি হিসাবে শিবনাথ সে সময়ে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া শিবনাথ যে একজন রীতিমতো 'লেখক' হয়ে উঠেছিলেন, 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁকে লিখতে না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই সেকথা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করেছেন।

এই বিরোধের মূল সম্ভবত আরও গভীরে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশ পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। দ্বারকানাথ শিবনাথের মাতুল ছিলেন। ভাষাদর্শের ব্যাপারে দ্বারকানাথ ও বঙ্কিমের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হত। শিবনাথ লিখেছেন : 'আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোম-প্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের নাম 'শব-পোড়া মড়াদাহের দল' রাখিলেন।...আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম।'[৭] বঙ্কিমগোষ্ঠীও প্রত্যুত্তরে সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্টাচার্যের চানা' নাম দিলেন।...অনুমান করি, এই সময় থেকেই বঙ্কিম ও শিবনাথের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সঞ্চার হয়েছিল।

বঙ্কিম তাঁর রচনায় কোথাও শিবনাথের নামোল্লেখ না করলেও উনিশ শতকের সমাজেতিহাস রচনা করতে গিয়ে শিবনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কোথাও বিরূপ মন্তব্য করেন নি। বরং তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে যোগ্যপূজা দান করেছেন।

শিবনাথ লিখেছেন : 'আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল।.. এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।...কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।.. ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক আকারে দেখা দিল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বঙ্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন, যাহা প্রকাশমাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল।...বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান সূর্যের ন্যায় লোক চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল।'[৮]

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. এই পুস্তক সমালোচনার তীব্রতার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি দল দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল।

২. বঙ্গদর্শন—জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮।

৩. '…ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনো প্রকারে হাতে পাইলেই গিলিয়া খাইতাম।' আত্মচরিত—পৃ. ৪৫

৪. আমার জীবন—১ম খণ্ড, (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ—১৩৬৬), নবীনচন্দ্র সেন। পৃ. ৪৫৯-৬০

৫. 'আকাঙ্ক্ষা', বঙ্কিমরচনাবলী—২য় ভাগ (সাহিত্য সংসদ), পৃ. ৯৪৪-৪৮

৬. চরিত চিত্র—বিপিনচন্দ্র পাল। পৃ. ২৫০

৭. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউএজ), পৃ. ২৫২-৫৩

৮. তদেব—পৃ. ঐ

শিবনাথ শাস্ত্রী : পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা

আমরা প্রথমেই শিবনাথ-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করছি এবং পরে একে একে সেগুলির আলোচনা করছি।

১. মদ না গরল ?—১৮৭১।
২. সোমপ্রকাশ—১৮৭৩-৭৪।
৩. সমদর্শী or The Liberal—১৮৭৪।
৪. সমালোচক—১৮৭৮।
৫. তত্ত্বকৌমুদী—১৮৭৮।
৬. সখা—১৮৮৫-৮৬।
৭. মুকুল—১৩০২-১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
৮. সঞ্জীবনী—১৯০৮।

১. মদ না গরল ?

কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেই ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে 'ভারত সংস্কার সভা' (Indian Reform Association) নামক একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পাঁচটি শাখার মধ্যে 'সুরাপান নিবারণী' অন্যতম শাখা ছিল। এই শাখার মুখপত্রের নাম 'মদ না গরল ?' শিবনাথ লিখেছেন, "আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। সে সমুদায়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।'[১] মিস্ এস. ডি. কলেট লিখেছেন,[২] 'The object of this section is to arrest the growth of intemperance among native population, especially among the better educated classes. A monthly Bengali journal entitled *Madh na Garal* (Wine or Poison) was started in April, 1871, and was largely distributed gratis. Much useful information, collected by the section, was published in this journal.' পত্রিকাটি যে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসেই প্রথম প্রকাশিত হয় তার অন্ত একটি প্রমাণ

রয়েছে ভারত সংস্কার সভার বার্ষিক বিবরণীতে—'A monthly journal in Bengali has been started for the diffusion of Temperance principles under the name of "Madh na Garal ?" (Wine or poison ?). The first number was issued in April',[৩] পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত ছিল। 'সোমপ্রকাশ'-এ তার ইঙ্গিত রয়েছে—'২৭ আষাঢ়, বুধবার। আমরা আহ্লাদিত হইলাম 'মদ না গরল' নামক পত্রিকাখানি পুনর্বার আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।'[৪] পত্রিকাটি যে কতদিন জীবিত ছিল তা নিশ্চয় করে বলতে পারিনা। তবে ১২৮০ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দেও যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি প্রমাণ আমরা উল্লেখ করছি।—'এত দিনের পর কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (১২৮০) মাসের 'মদ না গরল' প্রকাশিত হইয়াছে। মদ না গরল বিনামূল্যে বিতরিত হয়, সুতরাং ভিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না। সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। যদি জন্মভূমিকে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা থাকে তবে সকলে যত্ন করিয়া মদ না গরলকে রক্ষা করুন।'[৫]

বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও এদেশে পত্রিকাটির সন্ধান পাই নি। কাজেই পত্রিকাটিতে কি ধরণের লেখা প্রকাশিত হত বা পত্রিকাটির আকারই বা কেমন ছিল, তা জানতে পারিনি। তবে অন্য একটি পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে পরোক্ষভাবে মদ না গরলের চরিত্রের একটা আভাস পাই। '—মদ না গরল' বলেন হাবড়ার সন্নিকট পুরাতন সাঁয়েরে খুরুট নিবাসী কোন এক ভদ্র, ধনাঢ্য লোক আপন ভদ্রাসনের সম্মুখে একখানি মদের দোকান খুলিয়াছেন। ভদ্রলোকে আগে মদ স্পর্শ করা মহা পাপ জানিতেন, এখন তাহার ব্যবসায়ও চালাইতে লাগিলেন। কালে আরো কি হয় ?'[৬]

বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'মদ না গরল' প্রথম ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। সুরাপান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে প্রথম সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। কিন্তু এই সভার কোন মুখপত্র ছিল না। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার যে মাদকনিবারণী সভা স্থাপন করেন, তার মুখপত্র হিসাবে 'হিতসাধক'[৭] এবং 'Well Wisher' নামে দুটি পত্রিকা যথাক্রমে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ঐ প্যারীচরণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানে

উল্লেখযোগ্য যে, কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সভ্য ছিলেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী প্যারীচরণের প্রভাবেই মত্তপানবিরোধী হয়ে ওঠেন।[৮] প্যারীচরণের আন্দোলন ও 'হিতসাধক'-এর অনুসরণ করেই 'মদ না গরলের' প্রকাশ।

এই পত্রিকার মাধ্যমে যে আন্দোলন চালান হয়েছিল, তার পরিণামে এবং কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বড়লাটের নিকট প্রেরিত আবেদনের ফলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার কয়েকটি বিধি প্রবর্তন করেন। সেদিক থেকে শিবনাথের কৃতিত্ব কম নয়।

'মদ না গরল'-এর প্রভাব অন্যত্রও দেখা গেছে। এই পত্রিকার আন্দোলনই কেশবচন্দ্রকে 'আশাবাহিনী' বা 'Band of Hope' দল গঠনে প্রেরণা দিয়েছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।[৯]

এই পত্রিকাতেই পত্রিকা সম্পাদনের ব্যাপারে শিবনাথের হাতে খড়ি হয়। 'মদ না গরল'-এর প্রচার এবং আন্দোলনের ফল দেখে মনে হয় সম্পাদক হিসাবে চব্বিশ বছরের এই যুবকটি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

২. সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের এক অক্ষয় কীর্তি। এই পত্রিকাটি প্রকাশের যখন পরিকল্পনা হয়, তখন থেকেই শিবনাথ এর কথা শুনে এসেছেন। সংস্কৃত কলেজে শিবনাথ যখন পড়াশুনো করতেন, সে-সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথের সঙ্গে 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রকাশনা ব্যাপারে পরামর্শাদি করতেন। যাই হোক, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে দ্বারকানাথ বায়ু পরিবর্তনের জন্য কাশী যেতে মনস্থ করেন। কাশী যাওয়ার পূর্বে তিনি ভাগিনেয় শিবনাথকে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনার ভার দিয়ে যান। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক......হইয়া বসিলাম। বড়মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশী গেলেন।......সোম-প্রকাশের কার্যভার প্রধানত আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদপত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল।'[১০]

শিবনাথ ঠিক কোন সংখ্যা থেকে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন 'সোমপ্রকাশ'-এ তার উল্লেখ নেই। অথচ পূর্বে অন্য একটি উপলক্ষ্যে দ্বারকনাথ যখন সম্পাদকের

কর্মভার মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে অর্পণ করেন, তখন 'সম্পাদক-কৃত বিজ্ঞাপন'-এ তার উল্লেখ করেছিলেন।[১১] কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা আমরা শিবনাথের ভার গ্রহণের তারিখ নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। তাতে সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সুবিধা হবে।

১লা পৌষ ১২৮০ সংখ্যার পূর্ব সংখ্যা পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশ'-এর বিজ্ঞাপনে (পৃঃ ৬০) গ্রাহকবর্গকে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে টাকাকড়ি চিঠিপত্র পাঠাবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু ১লা পৌষ ও পরবর্তী ৮ই পৌষ ১২৮০ সংখ্যা থেকে পর পর কয়েকটি সংখ্যায় কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে টাকা পাঠাবার কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছে :

> 'গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য মণি-অর্ডারে পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে রেজীষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দেন।
>
> —অধ্যক্ষস্য'।[১২]

কাজেই অনুমান করি শিবনাথ সম্ভবত এই সংখ্যা থেকেই (১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৩) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ; যদিও এই সংখ্যার সম্পাদকীয় দ্বারকানাথেরই রচনা বলে মনে হয়। কারণ সম্পাদকীয়টি ছিল পূর্ববর্তী ৪র্থ সংখ্যার অনুবৃত্তিমাত্র। পরবর্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৮ই পৌষ) সম্পাদকীয় স্তম্ভের বিষয়বস্তু ভিন্নতর ছিল—'ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' নামক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন সভার কথা, সেখানে প্রসঙ্গক্রমে মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের কথা আলোচিত হয়েছে।

শিবনাথ মাত্র সাত মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করেন। ৫ই শ্রাবণ ১২৮১ (২০শে জুলাই ১৮৭৪) সংখ্যা পর্যন্ত সোমপ্রকাশের 'নিয়মাবলী'তে টাকাকড়ি-চিঠিপত্র কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠানোর অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু ১৯শে শ্রাবণ ১২৮১ (৩রা আগস্ট ১৮৭৪) সংখ্যায় দ্বারকানাথের নামেই টাকা পাঠাতে বলা হয়েছে। ১২ই শ্রাবণ ১২৮১ (২৭. ৭. ১৮৭৪) তারিখে 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে 'আমরা অনেকদিন বিদেশে ছিলাম, সম্প্রতি দেশে আসিয়া নিজগ্রাম ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম'। 'ভারত-সংস্কারক'ও ২রা শ্রাবণ ১২৮১ তারিখে দ্বারকানাথের প্রত্যাবর্তন সংবাদ জানিয়েছে। সুতরাং শিবনাথ ৫ই

শ্রাবণ ১২৮১ (২০. ৭. ১৮৮৪) সংখ্যা পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করে-ছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একথা লিখেছেন।[১৩]

'সোমপ্রকাশ'-এর খ্যাতি ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই সাত মাস শিব-নাথকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কলকাতায় শিক্ষকতা ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদনা করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম।' কাগজটির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার কথা উল্লেখ করে শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরমা ইংরেজি সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।'[১৪] অবশ্য এই ইংরেজি অংশ সংযোগের জন্য কাগজের অবনতি ঘটেছিল, এমন অভিযোগও শোনা যায়।[১৫]

পত্রিকাটি সম্পাদনা ছাড়াও সোমপ্রকাশের রিপোর্টার হিসাবে শিবনাথ মাঝে মাঝে কাজ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'স্মরণ আছে যে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলকাতায় আসিতাম।'[১৬]

শিবনাথের সম্পাদনাকালেও 'সোমপ্রকাশ'-এর নির্ভীক স্বভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল তা পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভ ও অন্যত্র প্রকাশিত লেখাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিনাভি, রাজপুর ইত্যাদি স্থানের প্রতি তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির অমনোযোগ দেখে পূর্ব থেকেই দ্বারকানাথ এই সকল স্থানের উন্নতির জন্য 'সোমপ্রকাশ'-এ আন্দোলন করে আসছিলেন। শিবনাথ এই আন্দোলনকে আরও বেগবান্ করে তুললেন। দ্বারকানাথ '......তৎকালীন হরিনাভি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের সাহায্যে এদেশে একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। সোমপ্রকাশের জলন্ত ভাষা এবং বিদ্যাভূষণের ক্রমাগত চেষ্টার গুণে'[১৭] রাজপুরে একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে স্বীয় উদ্যোগের কথা শিবনাথ তাঁর 'আত্ম-চরিত'-এ উল্লেখ করেছেন।[১৮] ৮ই পৌষ ও ২২শে পৌষ ১২৮০ সংখ্যার 'সোমপ্রকাশ'-এ এই 'জলন্ত' ভাষার প্রমাণ মিলবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধেও এই সাহসিকতার পরিচয় রয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সিভিল সার্ভিস হইতে বহিষ্কৃত' হলে শিবনাথ ইংরেজ সরকারকে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করেছিলেন।[১৯] 'ইংরেজি শিক্ষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল?'[২০] নামক প্রবন্ধেও এই সাহসিকতা প্রদর্শিত হয়েছে। 'চটি-পায় ব্রাহ্মণ' ছদ্মনামে যে শিবনাথ বাল্যকালেই এই সোমপ্রকাশে ইংরেজ উড্রোসাহেবের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, 'ইংরাজি জুতায় মান থাকে, আর আর চটি জুতায় মান যায় একথা আমি······ সাহেবের মুখেই শুনিলাম', তাঁর পক্ষে এ ধরণের প্রতিবাদ রচনা অস্বাভাবিক ছিল না। আর এই সৎ-প্রতিবাদই ছিল সোমপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য।[২১] 'আদালতে উৎকোচ গ্রহণের প্রতিবাদ'ও এই প্রকারের একটি রচনা।[২২]

'মদ না গরল' পত্রিকা সম্পাদনা করলেও সোমপ্রকাশেই শিবনাথের সাংবাদিকতায় যথার্থ শিক্ষানবিশী শুরু হয়। একদা যে পত্রের তিনি লেখকমাত্র ছিলেন—সেই পত্রেরই তিনি যোগ্য সম্পাদক হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শিবনাথের সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনে দ্বারকানাথের প্রভাব ছিল প্রভূত। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন, '*Somprokash* was, however a professedly political newspaper, and it has always been absolutely outspoken in its criticism of public policies and measures. And Shivanath had been trained by his Uncle as a Bengali writer······Vidyabhusan exerted very considerable influence in the making of Shivanath's mind and character.'[২৩]

৩. সমদর্শী

'সোমপ্রকাশ'-এ শিক্ষানবীশী শিবনাথকে স্বাধীনভাবে সাময়িকপত্র সম্পাদনের ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনার জন্য শিবনাথ যখন হরিনাভিতে বাস করছিলেন (১৮৭৪), সে সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একটি নূতন বিপদের সূচনা হয়েছিল। 'মহাপুরুষবাদ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে পূর্ব থেকেই একটা কেশববিরোধী গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু এবারে কেশবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রচার করল যে, যেহেতু প্রচারকগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত, সুতরাং তাঁদের কাজের বিচার মানুষ করতে পারবে না। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুবকগণ চেষ্টা করছিলেন, এ প্রচারে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে

একটি ভিন্ন দল গঠন করেন। এই দলের নাম 'সমদর্শী' দল। এই দলের মুখপত্র হিসাবে 'সমদর্শী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা শিবনাথের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ 'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পাদকত্ব ত্যাগের চার মাসের মধ্যেই। পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক, অর্থাৎ বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হত। এ সম্পর্কে 'সমদর্শী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়[২৪] লেখা হয়েছে যে, 'The journal will be conducted in English and Bengali that it may be accepted to the theists of other Presidencies. In short the Projectors aspire to make it, what it should be, an *impartial Exponent of Theistic Opinion.*'

শিবনাথ লিখেছেন, 'সমদর্শীতে আমরা কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীনভাবে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতাম।'[২৫] কেশবচন্দ্রের সমর্থকগণের প্রতিবাদ রবিবাসরীয় মিরারে প্রকাশিত হত। অর্থাৎ মুখ্যতঃই দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় বাদানুবাদই এই পত্রিকা প্রচারে প্রেরণা দিয়েছিল। সেকারণেই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধেই তৎকালীন ব্রাহ্মধর্মের বিবাদের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। আবার ব্রাহ্মধর্ম প্রধানত সমাজসংস্কারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল বলে তৎকালীন সামাজিক আন্দোলন, যথা—ব্রাহ্মবিবাহ, ১৮৭২ সালের তিন আইন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গও 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠায় আলোচিত হত।

কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও সম্পাদক নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে কখনই অশ্রদ্ধা করতেন না। 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠাতেই এই 'সমদর্শিতার' প্রমাণ রয়েছে—'ব্রাহ্মদিগের মিতাচার, ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ, ব্রাহ্মদিগের সচ্চরিত্রতা, অনুসন্ধান করিলে ইহার অধিকাংশেরই মূলে বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্যের বিষয় যে ইহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির হস্তে নেতৃত্বভার পড়িয়াছে।'

তবুও সাম্প্রদায়িকতাকে লেখক অস্বীকার করেন নি। বলেছেন, 'As long there is freedom of thought and freedom of discussion so long there must be division into *parties, sects, cliques* or whatever other names we may give them. No class of opinions, religious, social, moral or political, forms an exception of this.[২৬]

আবার পরমতসহিষ্ণুতারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। পত্রিকাটি প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্যও যে তাই, সেকথা পত্রিকায় একস্থানে লিখিত হয়েছে —'this journal is an humble attempt in that direction[২৬ক] 'সমদর্শী'র এই বিশিষ্ট চরিত্রের কথা উল্লেখ করে সম্পাদক আরও লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজে মতবিষয়ক স্বাধীনতা ও উদারতার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যেই সমদর্শীর সৃষ্টি। ইহাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে যাহার যাহা বলিবার আছে, বলিব এবং শুনিব, আবার পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে ত্রুটিবোধ করিব না। শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতিবাদ দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। এইজন্যই সমদর্শীতে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সকল স্থান পাইতেছে।' এইখানেই 'সমদর্শী' নামের সার্থকতা। অবশ্য এই নামটি নিয়ে সে সময়ে রহস্যও কম হয়নি। 'কোন রহস্যপ্রিয় সম্পাদক এই পত্রের সমালোচনায় বলিয়াছিলেন, ইনি সমদর্শী অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও জঙ্গম উভয় দলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।'[২৭]

প্রধানত ধর্মসমালোচনামূলক ও একটি বিশেষ দলের মুখপত্র ছিল বলে 'সমদর্শী' খুব বেশি পরিমাণে লেখক সংগ্রহে সমর্থ হয়নি। আমরা মোট সতেরো জন লেখকের নাম পেয়েছি। এরা প্রায় সকলেই 'সমদর্শী' দলভুক্ত। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের রাজনারায়ণ বসুর একটি ইংরেজি রচনার সংকলনও এই পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। শিবনাথ ব্যতীত অন্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন, শিবচন্দ্র দেব, মথুরানাথ বর্মণ, বঙ্গচন্দ্র রায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, পদ্মহাস গোস্বামী, নবীনচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর বসু, শিতিকণ্ঠ মল্লিক, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং কেদারনাথ কুলভী।

শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য) ছিলেন 'সমদর্শী'র প্রধান লেখক। পত্রিকাটিতে তাঁর বাংলা ও ইংরেজি রচনার সংখ্যা মোট ৬৩। শিবনাথ 'শি. না. ভ.' এবং 'শ্রীশিঃ'—এই দুই সংক্ষিপ্ত নামেও লিখেছেন। ধর্মবিবাদহীন কবিতাগুলি সবই শিবনাথের রচনা।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ সংখ্যায় 'য' ও 'ব' সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত রচনাদ্বয় যথাক্রমে বঙ্গচন্দ্র রায় ও যদুনাথ চক্রবর্তীর লেখা বলে অনুমান করি।

লেখক নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদক শিবনাথের একটি বিশেষ ধারণা ছিল।

তাঁর মতে ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে বিশ্বাসী একেশ্বরবাদী মাত্রেই 'সমদর্শী'র লেখক হিসাবে গণ্য হবার অধিকারী ছিলেন।—Here are welcome conservatives and progressives, professed Brahmos and theists who have not formally joined the Brahmo Samaj ; —in short whoever accepts the short and simple creed of theism as his faith and thereby seeks the moral and spiritual elevation of India. পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ব্যতীত পরে আরও একবার এই আহ্বান অন্যত্র বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, '…ইহাতে একেশ্বরবাদী মাত্রেরই লিখিবার অধিকার। এমনকি সম্পাদকের মত সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে না।'[২৮]

তবে লেখাগুলি সম্পর্কে সম্পাদকের একটি শর্ত ছিল—Every sensible article whether religious, social or moral, will be cordially accepted, provided it is written in a good and charitable spirit…The Editor will not hold himself responsible for the opinions expressed in the articles, and every article will bear the name of its author. সম্পাদক আরও চেয়েছেন লেখাগুলি এমন হবে, যার মধ্যে সত্যানুসন্ধান তো থাকবেই, আরও থাকবে 'the practical good of humanity'-এর চিন্তা। সম্পাদক এ সম্পর্কে লেখকদের সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন, 'We request our contributors to have their eyes fixed on this when they write articles for this journal.'[২৯]

এমন ধরণের লেখা যে এই পত্রে নেই তা নয়। তবে ধর্মকলহ-বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। ফলে পত্রিকাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও লেখকগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তত ফুটে ওঠেনি। শিবনাথের কবিতাগুলি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মতামত ও রীতিনীতিরই পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না।'[৩০] তা না পেলেও 'সমদর্শী'র উদ্দেশ্য অন্তত কিছু পরিমাণে সাধিত হয়েছিল। প্রধানত এই পত্রিকার প্রতিক্রিয়ার ফলেই 'কেশববাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্মদল ও যুবক ব্রাহ্মদলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন দিন'[৩১] বেড়ে গেছেলা। যার শেষ পরিণতি ঘটেছিল ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের বিচ্ছেদে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

প্রতিষ্ঠায়। ধর্মব্যাপারে 'সমদর্শী'র ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনাকে সর্বপ্রকারের অতিপ্রাকৃতত্ব ও অতিলৌকিকত্ব হইতেঃমুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত 'সমদর্শী' যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা করা হয় নাই'।[৩২] সুদূর মফঃস্বলেও এই ভাব বিস্তারিত হয়েছিল। '...সমদর্শী পত্রে এই সকল চিন্তা ও মতবৈষম্য প্রকাশ পাইতেছিল; মফঃস্বলেও সেই সকল ভাব সংক্রামিত হইতেছিল।'[৩৩]

'ধর্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক' এই মাসিক পত্রিকাটি কোন এক অজ্ঞাত কারণে কার্তিক ১২৮২ (অক্টোবর ১৮৭৫) সংখ্যার পর থেকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম বর্ষের বারোটি সংখ্যা ঠিক মত প্রকাশিত হয়। সতেরো মাস বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৭) মাসে। পর পর তিনটি সংখ্যা (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) প্রকাশিত হওয়ার পর 'সমদর্শী'র প্রচার একেবারে রহিত হয়। এর কতকগুলি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত, এ ধরণের বিবাদমূলক পত্রিকার প্রচার শিবনাথ আর বোধ করেন নি। দ্বিতীয়ত, পত্রিকাটি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একা শিবনাথকেই বহন করতে হচ্ছিল। শেষ সংখ্যার অব্যবহিত পূর্বের দুটি সংখ্যার (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪) সমস্ত রচনা শিবনাথকেই লিখতে হয়েছিল। মনে হয় এ ধরণের ধর্মীয় বিবাদে লেখকগণেরও হয়ত আর উৎসাহ ছিল না। তৃতীয়ত, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ ভয়ঙ্কর রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার জন্যও 'সমদর্শী'র প্রচার সহসা রহিত হয় বলে মনে করি।

৪. সমালোচক

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সমদর্শী' পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়ে গেলেও সমদর্শী দলটি ব্রাহ্মসমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শিবনাথ এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন আরও বেগবান্ হয়ে উঠলো বিশেষ একটি সংবাদে। ৩০শে জানুয়ারি তারিখে শিবনাথ তাঁর ডায়েরীতে এই নূতন সংবাদের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে বাবু লোকনাথ মৈত্র এক নূতন সংবাদ লইয়া আসিলেন। কুচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার শীঘ্র বিবাহ হইতেছে। কমিশনার সাহেব নাকি আগামী

৬ই মার্চ বিবাহ দিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেছেন।…আগামী মার্চ মাসে বিবাহ হইলে বড় পুঁটার বয়স চৌদ্দও সম্পূর্ণ হইবে না।'[৩৪] কুচবিহারের মহারাজা'ও তখন ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'সমদর্শী' দল এই প্রকারের বিবাহের বিরোধিতা করার জন্ম একটি বাংলা ও আর একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের বোধ করলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'এদিকে আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্ম ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে 'সমালোচক' নামে এক বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ ও ২১শে মার্চ হইতে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলাম। দুর্গামোহনবাবু ও আনন্দমোহন-বাবু উক্ত উভয় কাগজের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।…আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।'[৩৫] ৬ই মার্চ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষাধিক কাল পূর্বে 'সমালোচক'-এর আবির্ভাব।

আত্মচরিত থেকে জানতে পেরেছি পত্রিকাটি প্রথম ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও দেখেছি যে, 'The Kuchbehar marraige agitation soon gave rise to the issue of other periodicals. The 'Samalachak' (or 'Review') now a secular weekly, was started on February 17.'[৩৬] কিন্তু এই ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেই আবার লক্ষ্য করেছি (পৃ. ১৫) যে, প্রথম সংখ্যাটি ১৬ই ফেব্রুয়ারি (৫ই ফাল্গুন) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি ২৩শে ফেব্রুয়ারি (১২ই ফাল্গুন) তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে মনে হয়, পত্রিকাটি ১৬ই তারিখে মুদ্রিত হয়ে ১৭ তারিখে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকাটি প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি)।

বহু অনুসন্ধানেও এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির কোন সংখ্যা দেখতে সমর্থ হই নি। তাই পরোক্ষ উক্তির সাহায্যে পত্রিকাটির চরিত্র নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। 'সমদর্শী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল কেশবচন্দ্রের 'অগণতান্ত্রিক' মনোভাব ও 'মহাপুরুষবাদ'-এর সমালোচনা করা। তাছাড়া অন্তবিধ ধর্মীয় ও মৌলিক রচনাও 'সমদর্শী'তে প্রকাশিত হত। কিন্তু 'সমালোচক'-এর সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ভিন্নতর ছিল। এডুকেশন গেজেট[৩৭] 'সমালোচক'-এর প্রথম সংখ্যা পেয়ে লিখেছেন, 'সমালোচক সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র

সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে।' এই প্রসঙ্গে এডুকেশন গেজেট 'সমালোচক'-এর উদ্ধৃতিও দিয়েছেন :

'পত্রখানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটী মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটী কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা; গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।'

পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শিবনাথ কুচবিহারস্থ প্রতিনিধি মারফৎ ভিতরের সম্বাদাদি জ্ঞাত হয়ে 'সমালোচক'-এ 'সারস পাখির উক্তি'—এই পর্যায়ে ধারাবাহিক রচনা লিখতে আরম্ভ করেন।[৩৮]

গৌণ উদ্দেশ্যও যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাধিত হয়েছিল, মিস্ কলেটের পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য 'now a secular weekly' তার পরোক্ষ প্রমাণ।

শিবনাথের রচনা ব্যতীত পত্রিকাটির প্রথম ও অন্য কয়েকটি সংখ্যায় অন্যান্য কয়েকজনের প্রতিবাদপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। একথা আমরা মিস্ কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক থেকে জানতে পেরেছি। এ থেকে পত্রিকাটি তার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল, তা জানা যায়। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় উক্ত বিবাহের সংবাদ সমর্থিত হয়েছে দেখে ঐ দিনই গুরুচরণ মহলানবিশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীনাথ দত্ত—এই তিনজনে কেশব-বাবুর নিকটে গিয়ে শিবনাথ-রচিত একটি প্রতিবাদপত্র দিয়ে আসেন। এই প্রতিবাদপত্রের অনুক্রম হিসাবে আরও বহু প্রতিবাদপত্র আসতে লাগল। 'সমালোচক'-এ এই প্রতিবাদগুলির কিছু কিছু প্রকাশিত হতে থাকে।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় (১৬. ২. ১৮৭৮) প্রায় কুড়িজন ব্রাহ্মিকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের সংবাদে বিস্মিত ব্রাহ্মিকাগণ কেশবচন্দ্রকে লিখেছেন (কুমারী কলেট কর্তৃক ভাষান্তরিত), 'We could not even have imagined that any act of yours would ever be obstacle to female education, or injurious to women ; We are therefore exceedingly grieved at this unexpected act.'[৩৯] দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৩. ২. ১৮৭৮) হরগোপাল সরকার মহাশয়ের একটি প্রতিবাদ-পত্র এবং ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ ঢাকার আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদের বারো জনের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্রটিও মুদ্রিত হয়েছিল। ৬ই মার্চ

(২৩শে ফাল্গুন) তারিখে সমালোচকের সম্ভবত একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল (অথবা সাপ্তাহিক ক্রম অনুসারে প্রকাশিতব্য ১লা মার্চের সংখ্যাটি বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিল)। এই সংখ্যায় (৬. ৩. ১৮৭৮) গিরিজাসুন্দরী সেন, রাজলক্ষ্মী সেন প্রমুখ বিক্রমপুরের ব্রাহ্মিকাদিগের কয়েকজনের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত আনন্দমোহন বসুর লেখা প্রতিবাদ পত্রটি উল্লেখযোগ্য।[৪০] এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল স্তরই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা অবশ্য স্মরণীয়। 'সমালোচক' সম্পাদনা-কালেই শিবনাথের চাকুরী জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অনেকদিন থেকেই চাকুরী-ত্যাগের কথা তিনি ভাবছিলেন। কিন্তু এসময়েই তাঁর স্বাধীনতাবোধ এত উগ্র হয়ে ওঠে যে প্রচুর অর্থের লোভ ত্যাগ করে তিনি ১লা মার্চ ১৮৭৮ তারিখে কাজে ইস্তফা দেন।

শিবনাথ কত দিন 'সমালোচক' সম্পাদনা করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। অবশ্য তিনি যে অধিক দিন এর সম্পাদক ছিলেন না, কথা উল্লেখ করে শিবনাথ নিজেই লিখেছেন, 'এদিকে আমি নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে সমালোচক তুলিয়া লইয়া দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।'[৪১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে শিবনাথ 'সমালোচক'-এর দুই বা তিন সংখ্যা সম্পাদনা করেন।[৪২] ১৮৭৮ সালের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে (পৃ. ৯৩) 'Periodicals under Brahmo Management'-এর তালিকায় 'সমালোচক'কে 'Weekly General Newspaper' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং সম্পাদক হিসাবে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও ঐ একই প্রকার মন্তব্য দেখি (পৃ. ১০০)। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের তালিকায় 'সমালোচক'-এর কোন উল্লেখ দেখি না। এ থেকে মনে হয় যে, ১৮৭৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও খুব বেশি দিন চলে নি।

'সমালোচক' যে বেশি দিন চলে নি তার মুখ্য কারণ ইতিমধ্যে কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন থিতিয়ে এসেছিল ; আর গৌণ কারণ হল, চড়া সুরে বাঁধা তারে বেশি দিন সুর বাজে না। কাজেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে

শিবনাথের 'তাহাকে···(সমালোচককে) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না।'

যাই হোক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ও যা তাঁর কাছে অন্যায় বলে মনে হত, তার প্রতিবাদে শিবনাথের স্বরূপ এই পত্রিকাটির মাধ্যমে কিছুটা প্রকাশিত হতে পেরেছিল মনে করি।

৫. তত্ত্বকৌমুদী

কুচবিহার বিবাহানুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতময় ক্ষেত্রে যে নবতর দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত করেছিল, তার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়। এই নূতন সমাজের একটি মুখপত্র প্রয়োজন হল তাঁদের আপন বক্তব্যকে সাধারণের প্রচারের জন্য। শিবনাথ পত্রিকাটির আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, '·· আমরা নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী'; আদি সমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী'; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কাগজের নাম 'ধর্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে 'তত্ত্ব' এবং রাজা রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্বকৌমুদী'। ···১৮৭৮ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।'[৪৩] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ব্রাহ্ম শ্রেণী সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদী নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'তত্ত্ব' শব্দ এবং রামমোহন রায়ের প্রকাশিত কৌমুদী পত্রিকার নাম দুই একত্র করিয়া আপনাদিগের প্রকাশিত পত্রিকার নামকরণ করিয়াছেন।'[৪৪] বিপিনচন্দ্র পালও ঐ একই কথা লিখেছেন।[৪৫]

'রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে', সেই ধর্ম ভাবের প্রচারোদ্দেশ্যেই শিবনাথ 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যত মতভেদের কারণে স্পষ্ট বলে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় অনিবার্যভাবে দলগত বা সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমালোচনা প্রকাশিত হতে লাগল। সে কারণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

এই নবপ্রকাশিত পত্রিকাটিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে লিখেছেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় পত্রিকা যতই প্রকাশিত হয় ততই আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়…। তিনি (সম্পাদক) কেবল ঈশ্বর ও ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্মের মত প্রচার করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হইবেন সন্দেহ নাই। এবার তত্ত্বকৌমুদীতে যেমন বিবাদ বিসম্বাদের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে ভরসা করি সহযোগী সেইরূপ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী ধর্ম জগতের উপর বর্ষণ করিয়া লোকের প্রাণমন শীতল করিবেন।'[৪৬]

প্রধানত সাম্প্রদায়িক কারণে আবির্ভূত হলেও তত্ত্বকৌমুদীতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হত। আসলে ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাই ছিল, জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের একেশ্বরবাদমূলক উপদেশাদির সার গ্রহণ ও প্রচার। বাইবেল, পার্কারের 'টেন্ সারমন্‌স্', নিউম্যান, গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নানা উপদেশ ও আখ্যানের আলোচনা তত্ত্বকৌমুদীর বৈশিষ্ট্য ছিল। আবার ধর্ম-বিষয়ক নানা কবিতার (শিবনাথ এগুলির বেশির ভাগেরই রচয়িতা ছিলেন) প্রকাশ দ্বারা পত্রিকাটিকে একটি সাহিত্যিক মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ যে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে তিনটি ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তারই মূল কারণ যতটা সামাজিক ও ব্যক্তিগত, ততটা ধর্মগত নয়। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই তত্ত্বকৌমুদীতে তৎকালীন নানা সামাজিক প্রশ্নও আলোচিত হতে লাগল। বিশেষ করে Act III of 1872—বিবাহ সম্পর্কিত এই আইনটি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ সমূহের মুখপত্রগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বিতর্কমূলক এই সামাজিক সমস্যাগুলি ব্যতীত নানা সামাজিক উপদেশও শিবনাথ প্রকাশ করতেন।[৪৭]

পাশ্চাত্য দর্শনসমূহের আলোচনা উনিশ শতকের মনীষীদের মুখ্য বিষয় ছিল। বিশেষ করে হিউম, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির দর্শনচিন্তা প্রাচ্যদেশেও প্রভূত পরিমাণে চর্চা করা হচ্ছিল। 'জড়বাদ' এই প্রকার চিন্তার মধ্যে অন্যতম ছিল, তত্ত্বকৌমুদীতে এই 'জড়বাদ',[৪৮] 'মানবপ্রকৃতি'[৪৯] প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন-সমূহেরও আলোচনা প্রকাশিত হত।

পুস্তকাদির রিভিউ প্রকাশ, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা যথারীতি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় থাকত। তবে পত্র-পত্রিকার আলোচনাগুলি দলগত কারণে কিঞ্চিৎ তিক্তরসযুক্ত থাকত। এগুলিকে পত্রিকামূলক কলহবিচার বলা যেতে

পারে। বিশেষত তত্ত্ববোধিনী ও ইণ্ডিয়ান মিরারের সঙ্গে এই প্রকারের বিচার মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। তত্ত্বকৌমুদীর এই চরিত্রটি যথাযথ অনুধাবনের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করছি। ১লা চৈত্র ১৮০০ শক সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী' কেশব-দেবেন্দ্রের সংঘাতকে 'একতন্ত্র-প্রণালী প্রিয়তার' সঙ্গে 'সাধারণতন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তার' দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করায় 'তত্ত্ববোধিনী' তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।[৫০] আবার ১৬ই বৈশাখ ১৮০১ সংখ্যার 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে ব্রাহ্মবিবাহের যে প্রতিবাদ ('সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী' শীর্ষক) প্রকাশিত হয়, আষাঢ় সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে সেই প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই কলহের সূত্র ধরে আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পরিশেষে লিখেছেন, 'আমরা আমাদিগের সহযোগীকে এ পর্যন্ত অনেক কথা বলিয়াছি, তথাপি তিনি বুঝিলেন না, অতএব তাহাকে বুঝাইবার বিষয়ে আমাদিগকে অবশেষে পরাজয় মানিতে হইল' (পৃ. ১০৯)। দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে এই বিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন বলা অসঙ্গত হবে না। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যারত্ন এবারকার পত্রিকাতেও কৌমুদীকে খুব প্রহার করিয়াছেন, খুব চাবুক দিয়াছেন। তাহার আর মাথা উঠান ভার হইবেক।'[৫১]

এই সব কারণে বলা যেতে পারে যে, তত্ত্বকৌমুদী একটি সাধারণ সংবাদ-পত্রের মত প্রচারিত হয়নি। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'তত্ত্বকৌমুদী আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতত্ত্বের মত কেবল ব্রাহ্মসমাজের মতবাদই প্রচার করিত, সাধারণ সংবাদপত্র ছিল না।'[৫২]

তত্ত্বকৌমুদীকে শিবনাথ আত্মজের স্নেহে লালন করে এসেছেন। কারণ এটি শিবনাথ-সম্পাদিত পত্রিকা (দ্বিতীয় পত্রিকা), যাকে তিনি স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করেছিলেন এবং যেটি তাঁর স্বাধীন মতামতের বাহক ছিল। 'তত্ত্বকৌমুদী'কে পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য শিবনাথ অশেষ যত্ন করেছেন। প্রথম দিকের তত্ত্বকৌমুদীর প্রতিটি রচনা শিবনাথেরই ছিল এমন মন্তব্য করা অত্যুক্তি হবে না। শিবনাথ নিজেই লিখেছেন, 'অনেকদিন এরূপ হইত, তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না।... এক একদিন এমন হইয়াছে, দুই পত্রিকা একদিনে বাহির হইবার কথা। প্রত্যূষে স্নান ও উপাসনান্তে প্রেসে বসিয়াছি, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ সারিয়া

তত্ত্বকৌমুদীর কাজ, তত্ত্বকৌমুদীর সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ, এইরূপ সমস্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি।'[৫৩] মনে রাখতে হবে যে, এই পরিশ্রম-শক্তি শিবনাথ তাঁর মাতুলের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখক সংগ্রহের ব্যাপারে শিবনাথ অনেকাংশে উদার ছিলেন। আনন্দচন্দ্র মিত্র, শশিভূষণ বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের লেখা ব্যতীত তত্ত্ববোধিনী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সারাংশাদিও 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও শিবনাথ লেখক-গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।[৫৪]

অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কর্মের ডাকে শিবনাথকে প্রায়ই বাইরে যেতে হত। সে সময়ে এবং শিবনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। যেমন, দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিবনাথ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গেলে তৃতীয় বর্ষের ত্রয়োবিংশ সংখ্যা থেকে কৃষ্ণকুমার মিত্র; অষ্টম বর্ষের কার্তিক সংখ্যা থেকে সীতনাথ দত্ত, নবম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা থেকে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ব্যক্তি 'তত্ত্বকৌমুদী' সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু দূরে গেলেও পত্রিকাটির প্রতি শিবনাথের তীক্ষ্ণ নজর থাকত।

শিবনাথের সাক্ষাৎ যত্নের ফলে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি আয়ও বেড়েছিল প্রচুর। তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় দেখছি যে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা হয়েছিল ৪৫০। আর যে সময়ে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রতি মাসেই প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করছে, সে সময়ে 'তত্ত্বকৌমুদী' উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাভ করেছে। 'তত্ত্বকৌমুদী—গত তিন মাসে ইহার আয় ২২১৸৶১০, ব্যয় ১৮৪৲।'[৫৫] ১লা কার্তিকের (১৮০৫ শক) পূর্বের তিন মাসে নীট আয় হয়েছিল ১২০৶০২।

শিবনাথ আপন নিষ্ঠা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 'তত্ত্বকৌমুদী'র প্রচারে যে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন, তার ফলে আজ দীর্ঘ ১০৮ বছর ধরে সেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। সে যুগের কোন সাময়িক (পাক্ষিক) পত্রিকাই অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে এমন দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয় নি।

৬. সখা

শিশুদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশের প্রথম পর্বে 'সখা' একখানি উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। তরুণ বয়স্ক প্রমদাচরণ সেন এই পত্রিকাটি ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করেন। এই প্রমদাচরণ সেন শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রমদা হেয়ার স্কুলে আমার নিকট পড়িত,…প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল।'[৫৬]

কাজেই অনুমান করতে বাধা নেই যে, 'সখা'র জন্মমুহূর্ত থেকেই শিবনাথ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগস্ট ১৮৮৪ সংখ্যা থেকে শিবনাথ 'সখা'র পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করেন।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে প্রমদাচরণের মৃত্যু হয়। প্রমদাচরণের অকৃতকার্য সমাপ্ত করার জন্য শিবনাথ পরবর্তী জুলাই সংখ্যা থেকে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (জুলাই ১৮৮৫) থেকে সমগ্র চতুর্থ বর্ষের (১৮৮৬) 'সখা'র সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যার (জানুয়ারি ১৮৮৭) সম্পাদকীয়ও তিনি লিখেছিলেন।

'সখা' পত্রিকায় শিবনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (আগস্ট, ১৮৮৪)—'স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস)' নামক একটি সচিত্র জীবনী। সম্পাদক হিসাবেও তিনি 'সখা'র পৃষ্ঠার বহু জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। আমরা সেগুলির উল্লেখ করছি ;—রামতনু লাহিড়ী (মার্চ ১৮৮৫), প্রমদাচরণ সেন (জুলাই ১৮৮৫)। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (অক্টোবর ১৮৮৫), বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর (জানুয়ারি ১৮৮৬), জোসেফ ম্যাটসিনি (মার্চ ১৮৮৬) ; স্যার উইলিয়ম জোন্স (জুন ১৮৮৬), স্বর্গীয় দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬), পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৮৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জানুয়ারি ১৮৮৭)।

অন্যান্য বহু শিশুপাঠ্য রচনার মধ্যে সাধের নৌকা (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫), আবদারে ছেলে (জানুয়ারি ১৮৮৬), রামকান্তের ঘোড়া (মে ১৮৮৬), শ্যামচাঁদের পাঁচদশা (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬), পেটুক পুষি (জানুয়ারি ১৮৮৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সখা'র পৃষ্ঠায় একটি নূতন বিষয়ের সূত্রপাত করেন শিবনাথ। সেটি হল বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা। 'বায়ুমণ্ডল' নামে একটি অসমাপ্ত বিজ্ঞান বিষয়ক

রচনা জুন ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রমদাচরণ যে উদ্যোগ ও কৃতিত্বের সঙ্গে 'সখা'কে প্রথম শ্রেণীর শিশুমাসিকে পরিণত করেছিলেন, শিবনাথ তাঁর সহজাত অধিকার ও পূর্ব অভিজ্ঞতাবলে পত্রিকাটিকে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। প্রমদাচরণের মৃত্যুর পর প্রমদার বহু অপ্রকাশিত রচনা শিবনাথ এই পত্রে প্রকাশ করেন। নূতন লেখক-গণের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ ইনি ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। এঁর লেখা একটি কবিতা 'ছেলেখেলা' প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৮৮৫ সংখ্যায়। এই ঔদার্য আরও প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রে। তবু প্রমদাচরণ ব্রাহ্মভাবপূর্ণ রচনা প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রমদাচরণ যা পারেন নি, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়েও শিবনাথ তা পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টতঃই বুঝেছিলেন যে সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির গণ্ডী পার হলেই তবে শিশুদের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগ করা সম্ভব হবে। ফলে হিন্দু-ব্রাহ্মের মধ্যগত ভেদরেখাটি লুপ্ত হয়ে যথার্থ শিশুপত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন অন্নদাচরণ সেন। জুন ১৮৮৭ সংখ্যার পর শিবনাথের কোন রচনা (অন্তত স্বনামে) প্রকাশিত হতে দেখি না। এ ছাড়া, মে ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভরত বিলাপ' নামক কবিতাটি এবং জুন ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বায়ুমণ্ডল' নামক রচনাটির শেষে 'ক্রমশ:' লেখা থাকা সত্ত্বেও রচনা দুটি আর প্রকাশিত হয় নি। অনুমান করি, হয়ত এই সময় থেকে কোন কারণে শিবনাথের সঙ্গে তৎকালীন 'সখা' সম্পাদকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

৭. মুকুল

'সখা'র ক্ষেত্রে শিশুসাহিত্যের সঙ্গে শিবনাথের পরিচয়ের অঙ্কুর 'মুকুল'-এ গিয়ে মুকুলিত হয়ে উঠল। বাংলা ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে (ইংরেজি ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে) শিবনাথের সম্পাদকত্বে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। গুরুচরণ মহলানবিশের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং শিবনাথের কন্যা হেমলতার উদ্যোগে একটি নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি এই নীতিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা।

ছিলাম।......কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৫ সালে) ইহারা বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া 'মুকুল' নাম দিয়া এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছুদিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম।'[৫৭]

কয়েকটি বালিকার উদ্যোগে এই ধরণের পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস নবতর সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। '১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবত শিশুদের কোন ভাল কাগজ ছিল না...শিশুদের আনন্দ দিবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে, প্রধানত তাঁর (রামানন্দ) উদ্যোগে ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে 'মুকুল' নাম দিয়া একটি শিশুপাঠ্য সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল উৎসাহী যুবকেরা বলিয়া-কহিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মুকুলের সম্পাদক করেন। সহকারী-সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু। আত্মভোলা উদাসীন রামানন্দ অন্তরালে ছিলেন, কিন্তু কি রচনা-সংগ্রহে কি স্বয়ং রচনায় তাঁর উৎসাহ ইহাদের অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না।'[৫৮]

সচিত্র এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রস্তাবনায় বিবৃত হয়েছে—'জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মুকুল, সকল ভাল বিষয়েরই মুকুল অবস্থা আছে। এই পত্রিকা যাহাদের জন্য, তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল।...মানব মুকুলদিগকে ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য। আমরা মানব মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত হইবে।' বাস্তবিকই পত্রিকাটি বিচিত্র জ্ঞানের মুকুলে সুরভিত হয়ে উঠেছিল। যে 'মানব-মুকুল'দের প্রয়োজন স্মরণ করে গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা ও চিত্রের বিচিত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল, উদ্যোক্তাগণ যে তাদের সম্পর্কে কতখানি সজাগ ছিলেন, 'মুকুল'-এর পৃষ্ঠাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। 'অনেকের ধারণা আছে, 'মুকুল' ছোট ছোট শিশুদের জন্য, অর্থাৎ যাহাদের বয়স ৮।৯ বৎসরের মধ্যে প্রধানত তাহাদের জন্য। 'মুকুলে' এমন কথা থাকে, যাহা এত অল্প বয়স্ক শিশুগণ বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার কথাও নহে। যাহাদের বয়স ৮।৯ হইতে ১৬।১৭-এর মধ্যে ইহা প্রধানত তাহাদের জন্য। আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক-বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি।'[৫৯] এ থেকে মুকুলের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই একটা ধারণা মুকুলের

পাঠকগণের পক্ষে করে নেওয়া সহজ হয়েছিল। বয়সের কথা-প্রসঙ্গে মনে হতে পারে যে ১৬।১৭ বছরের ছেলেদের উদ্দেশ্যে রচিত লেখাগুলি যথার্থই শিশুপাঠ্য কিনা। প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টতই বলেছিলেন, 'শিশু-সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না ; আর শিশুরা সমাজের আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করে না।' তাঁর মতে শিশুপাঠ্য না হোক বালক-পাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত।[৬০] প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে শিব-নাথের মতের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। বলা যেতে পারে শিশুপাঠ্য পত্রিকা সম্পর্কে বয়সের এই সীমা নির্ধারণ সঠিক এবং বিজ্ঞান-সম্মত।

কাগজটিকে সর্বপ্রকারে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে শিবনাথের বিচিত্র প্রয়াস কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। রচনা-বৈচিত্র্য ব্যতীত নানাবিধ কৌতুককর বিজ্ঞাপন, রচনা সম্পর্কে পাঠকগণের মতামত আহ্বান, শিশু-রচনা প্রকাশ মুকুলের বৈশিষ্ট্য ছিল। 'তোমরা মুকুলকে ভালবাস, একথা কি আমাদিগকে জানিতে দিবে না? ...যাহারা মুকুলকে ভালবাস, তাহারা যদি এক একখানি পোষ্টকার্ডে 'আমি মুকুলকে ভালবাসি', এই কয়টি কথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাও, তবে আমরা সেই কার্ডখানি রাখিয়া দিব।'[৬১] মুকুলকে জনপ্রিয় করার জন্য এই চিন্তা অভিনব বলা যেতে পারে। অবশ্য শিবনাথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টান্তে এই প্রকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আবার বালক-বালিকাদের সৎকার্যের নানা বিবরণের প্রকাশের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পাঠক বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করেছিল।

কিন্তু যে গুণে 'মুকুল' শিশুচিত্তকে সর্বাধিক পরিমাণে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল, তা হল এর চিত্র-সম্পদ্। প্রায় প্রতিটি রচনা চিত্রসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হত। ছবিগুলি অনেক সময়ে বিলাতী পত্র-পত্রিকা থেকে গৃহীত হত। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে নানা আখ্যান-ভিত্তিক চিত্রাবলী ছাপিয়ে সে সম্পর্কে কবিতা ইত্যাদি রচনার আহ্বান জানিয়ে তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেওয়া হত। চতুর্থ বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় চিত্র-অনুসারে কবিতা লিখে বালক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পুরস্কার পান।[৬২] পরে এই ছবিগুলির অনেকগুলি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থসমূহে তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে ছবিগুলি অবলীলাক্রমে যোগীন্দ্র-নাথেরই স্বত্বাধিকার পেয়েছে। অথচ শিবনাথের কথা আজ আর কেউ ভাবে না। কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত 'বালক বন্ধু' থেকে 'মুকুল' পর্যন্ত সব পত্র-পত্রিকাতেই

রচনার সঙ্গে চিত্র মুদ্রিত হয়ে এসেছে। সেদিক থেকে শিবনাথ নূতন কিছু প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু ছবি ছাপার ব্যাপারে 'মুকুল'-এর কর্তৃপক্ষের প্রয়াস যে কতখানি আন্তরিক ছিল, শান্তাদেবী তার সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন, 'মুকুলে একটিমাত্র কবিতায় রঙীন ছবি দিবার জন্য ইহারা পোটো ডাকিয়া আনিয়া কাঠের ব্লকে ছাপা প্রতি কপি আলাদা আলাদা করিয়া হাতে রং দেওয়াইয়া ছিলেন।'[৬৩]

'মুকুল'-এর সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের অপর সিদ্ধি লেখকগোষ্ঠী আহ্বান ও নূতন লেখক আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। সম্পাদক হিসাবে তিনি নিজে তো লিখতেনই, তাছাড়া বাংলাদেশের তৎকালীন সমস্ত প্রতিভাকে তিনি 'মুকুল'-এর পৃষ্ঠায় আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথম বৎসরের 'মুকুল'-এ সর্বমোট ২৯ জন লেখক-লেখিকার মধ্যে অবলা বসু, কুসুমকুমারী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রমণীমোহন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বছরে আরোও লিখেছেন, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অতুলপ্রসাদ সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বালক সুকুমার রায়, হরিহর শেঠ, অমৃতলাল গুপ্ত, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। উপযুক্ত দীর্ঘ তালিকা থেকে পত্রিকা হিসেবে 'মুকুল'-এর মূল্য স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। এতগুলি প্রতিভার একত্র সমাবেশ তৎকালীন, এমন কি বর্তমানেও কোন পত্রিকায় সম্ভব হয়নি—এমন মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না।

প্রতিষ্ঠিত লেখকগণকে আহ্বান করা ব্যতীত নূতন লেখক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের কৃতিত্ব অনেকাংশে গুপ্তকবির সঙ্গে তুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দের গুরু হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, শিবনাথ অবশ্যই সেই মর্যাদার অধিকারী। কারণ সুকুমার রায়, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বালককে রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তাঁদের উত্তরকালের সাহিত্য-সাধনায় শিবনাথ প্রথম গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। আট বছরের বালক সুকুমার রায়ের প্রথম কবিতা 'নদী' মুকুলেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সংখ্যায়। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বালক-বালিকারা যাতে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়, সেজন্য শিবনাথ নানা

পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। চিত্র-কাহিনী রচনা আহ্বান, 'কোনও পাঠিকার একটি সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা ছাপিয়া' প্রকাশ, বালক-বালিকাগণের নানাপ্রকার সৎকার্যের বিবরণ প্রকাশ, ধাঁধার উত্তরদাতাদের (১৬ বছরের অনধিক) বর্ষশেষে দশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা, বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি পৃষ্ঠায় মেয়েলী ঘরকন্না বিষয়ে রচনা প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা পাঠক-পাঠিকা মহলের একাংশকে রচনাকর্মে আকর্ষণ করেছিলেন সম্পাদক শিবনাথ। আধুনিককালে শিশুপাঠ্য পত্রিকায় বালকদের জন্য কয়েকটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট রাখা হয় তাদের সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য, শিবনাথ শাস্ত্রীই ছিলেন এর পথপ্রদর্শক।

লেখকদের মত লেখাগুলিও লক্ষ্য করার মত। কেবলমাত্র 'মুকুল'-এর পৃষ্ঠা থেকেই শিবনাথ এবং অন্যান্য লেখকদের রচনাসংগ্রহ করে একটি মনোরম শিশুপাঠ্য সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব—এমনই রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। কুসুমকুমারী দাসের সুবিখ্যাত 'আদর্শ ছেলে' (পৌষ ১৩০২), জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' (আষাঢ় ১৩০২) ও 'যন্ত্রের সাধন' (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩০৫), রবীন্দ্রনাথের 'কাগজের নৌকা' (আশ্বিন ১৩০৩) ও 'সুখ ও দুঃখ' (শ্রাবণ ১৩০৩), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর প্রথমাংশ (শ্রাবণ ১৩০৩), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মজার মুল্লুক' (কার্তিক ১৩০৫) প্রভৃতি সুবিখ্যাত রচনাগুলি 'মুকুল'-এর পৃষ্ঠাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শিব-নাথের লেখা শিশুপাঠ্য গল্প-সংকলন সম্প্রতি 'ছোটদের গল্প' (১৯৬৪) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র-রচনাগুলিতে সব সময়েই পাঠকগণকে লেখার জন্য আহ্বান করা হত। পূর্বোল্লিখিত বারীন্দ্রনাথ ঘোষের চিত্র-রচনাটির উপর যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর একটি কবিতা 'বেজায় ধূর্ত' নাম দিয়ে লিখেছিলেন ; এটি তাঁর 'হাসিরাশি' বইটিতে সংকলিত আছে। সম্পাদক শিবনাথও ছবিগুলির কোন কোনটির উপর কবিতা রচনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (ভাদ্র ১৩০২) কবিতাটির উল্লেখ করছি। এই ছবিটির উপর যোগীন্দ্রনাথ সরকারও 'সাপ নয় তো যম' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

'মুকুল' পত্রিকার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল নানা জীবনী প্রকাশ করে পাঠককুলের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপনের মধ্যে। স্বয়ং সম্পাদক এই ধরণের জীবনী-রচনায় সর্বাধিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। জাতীয় গৌরববোধ, স্বদেশপ্রেম ও

চরিত্রগঠন—এই রচনাগুলির প্রধান শিক্ষা ছিল।

শিশুদের জন্য নানা ভৌতিক রচনা আধুনিককালের শিশুপাঠ্য পত্রিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের পক্ষে এই ধরণের তরল চিন্তা ক্ষতিকর হবে ভেবে সম্ভবত শিবনাথ 'মুকুল'-এ কোন ভূতের গল্প প্রকাশ করেন নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'বলবন্ত সিংহ'কে কোনক্রমেই ভৌতিক গল্প বলা চলে না। বরং একে রূপকথা জাতীয় রচনা বলাই সঙ্গত।

এই রূপকথার রস পরিবেশণে শিবনাথের যত্নের ত্রুটি ছিল না। সেজন্তে তিনি নিজে বিদেশী রূপকথার অনুবাদ ক'রে 'মুকুল'-এ প্রকাশ করেছিলেন।[৬৫] উপকথাগুলি যথাক্রমে এই: (১) সখের যাত্রার দল (আশ্বিন ১৩০২), (২) কাঠুরের মেয়ে (কার্তিক ১৩০২), (৩) হাতকাটা মেয়ে (পৌষ ১৩০২), (৪) না বুঝে করিলে কাজ শেষে হায় হায় (মাঘ ১৩০২), (৫) হংসরূপী রাজপুত্র (চৈত্র ১৩০২)।

আধুনিককালে 'একটুখানি হাসো' ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকার যে স্তম্ভ থাকে, সেই ধরণের চুটকি রচনার সূত্রপাত শিবনাথ 'মুকুল'-এই প্রথম করেছিলেন। কৌতুহলোদ্দীপক হবে ভেবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করছি:

মা। কিরে, হরে তুই কাঁদছিস যে?

ছেলে। ভোলা-আ-আ—আমাকে মে-রে-ছে—।

মা। তুই তাকে আচ্ছা করে ফিরিয়ে দিলিনে কেন?

ছেলে। আ-মি-আগেই ফিরিয়ে দি-ছি-লু-ম![৬৬]

সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের কৃতিত্বের কথা আমরা আর একবার আলোচনা করছি। সম্পাদকের যে একটা দায়-দায়িত্ব থাকে সম্পাদনার ব্যাপারে, শিবনাথ সে সম্পর্কে পুরো মাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন। কোন রচনা প্রকাশ করার পূর্বে তাকে প্রয়োজনবোধ করলে সংস্কার করে নিতেন। আবার রচনার মৌলিকতা বিষয়ে সন্দেহ জাগলে তিক্ত-কষায় ভাষায় সমালোচনাও করতেন। কোন এক গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত 'সর্পের কৃতজ্ঞতা' (আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০৪) নামক রচনাটি প্রকাশ করে সম্পাদক পাদটীকায় লিখেছেন, 'গল্পটী সত্য কিনা জানি না, কোন্ পুস্তকে তিনি এই গল্পটী পাইয়াছেন, লেখক তাহা জানাইলে, ভাল হইত। শেষ অংশ অসম্ভববোধে পরিত্যক্ত হইল।' জনৈক কবির নামক এক পাঠক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'জ্ঞানমুকুল' বইয়ের 'ছোটপাখী' নামক কবিতাটি চুরি করে

প্রকাশ করতে চাইলে শিবনাথ তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, পৃ. ৩১)। দশচক্রে ভগবানের প্রেতযোনি-প্রাপ্তির প্রবাদ আমরা জানি। কিন্তু স্বয়ং সম্পাদককেও একবার এই প্রকারের পরস্বাপহরণের অভি-যোগে সোপর্দ হতে হয়েছিল। 'পত্র প্রেরকদিগের প্রতি'[৬৭] সূত্রে লক্ষ্য করি 'মুকুল'-এর একজন 'হিতাকাঙ্ক্ষী' সম্পাদক-রচিত 'তিনটি বর' (আষাঢ় ১৩০৩) নামক গল্পটি শিবনাথ কোথা থেকে অপহরণ করেছেন—এমন ইঙ্গিত করে চিঠি লেখায় শিবনাথ লিখেছেন যে, 'পত্র প্রেরকের নাম জানিতে পারিলে, তার কোন উপকার না হউক, তাঁহার শিক্ষা এবং রীতিনীতির সুবন্দোবস্তের জন্য অন্ততঃ তাঁহার পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে পারিতাম।'

সুসম্পাদনার গুণে 'মুকুল'-এর বহুল প্রচার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশের প্রায় দেড় বছরের মধ্যে 'মুকুল'-এর গ্রাহক সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক হয়েছিল— 'আমাদের দেড় হাজারেরও অধিক গ্রাহক আছেন···'।[৬৮] গ্রাহকদের মধ্যে মুকুলের প্রভাব কেমন ছিল, সে সম্পর্কে দৌলতপুর-নিবাসী জনৈক কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'সঙ্কটে প্রাণরক্ষা' নামক যে চিঠিখানি সম্পাদককে পাঠিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিরাট এক চিঠির বক্তব্য হল এই যে, একটি বালক নিদারুণ অসুস্থ হয়ে যখন বিকারগ্রস্ত হয়, তখন 'মুকুল' পত্রিকা পাঠে সে আশ্চর্যজনকভাবে রোগমুক্ত হয়। 'মুকুল'-এর এই মুষ্টিযোগ দেখে বালকটির পিতা বলেন, 'যেদিন মুকুল আসে তাহার মুখে সেদিন আর হাসি ধরে না। এমন সুন্দর কাগজের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।'[৬৯] ঘটনাটি কল্পিত কিনা জানি না, তবে মুকুলের প্রচার এত বেশি হয়েছিল যে তার প্রশংসা সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল,—মুকুলের একটি বিজ্ঞাপন থেকে একথা জানতে পারি।

১৩০৭ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করার পর শিবনাথ 'মুকুল'-এর সম্পাদনা ত্যাগ করেন এবং হেমচন্দ্র সরকার সেই ভার গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধি এবং অসুস্থতার কারণে শিবনাথ এই ভার ত্যাগ করেন বলে মনে হয়। কিংবা হয়ত মুকুলের প্রকৃতির সমতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে যে কোন কারণেই সম্ভব হচ্ছিল না। 'সাহিত্য' পত্রিকার একটি সমালোচনায় এমন ইঙ্গিত লক্ষ্য করি—'পৌষ ও মাঘ। মুকুল শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। শিশুপাঠ্য একমাত্র মাসিকেরই এই দশা! দেশের প্রশংসা করিব, না অদৃষ্টের নিন্দা করিব!···মুকুল আমাদের

বড় আদরের,—মালীর নিকট প্রার্থনা করি, মুকুল যেন শুকাইয়া ঝরিয়া না যায়।'[৭০]

২

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভারত সংস্কারসভার মদ্যপান-নিবারণী শাখার মুখপত্র 'মদ না গরল' পত্রিকা-সম্পাদনায় হাতে খড়ি হওয়ার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শিবনাথ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা-সম্পাদনা করে সম্পাদক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পূর্বালোচিত পত্রিকাগুলি ছাড়া আরও দুটি পত্রিকার সঙ্গে তিনি স্বল্পদিনের জন্য সম্পাদনার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 'সঞ্জীবনী' একটি। রামগতি ন্যায়রত্ব 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক তালিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র ছাড়া আরও দুজনের নাম উল্লেখ করেছেন[৭১]—এঁরা হলেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তৎকালীন সরকার নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলে 'সঞ্জীবনী'র প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে। অথচ পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে শিবনাথের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। এই সময়ে শিবনাথ যে 'সঞ্জীবনী'র পরোক্ষ সম্পাদক হয়ে পড়েছিলেন, তার কয়েকটি প্রমাণ আমরা তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরি থেকে উল্লেখ করছি। 'কৃষ্ণকুমার বাবুকে যে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে 'সঞ্জীবনী' যে কিরূপে চালান যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ হইল (ডায়েরির তারিখ ২০. ১২. ১৯০৮)। এই পরামর্শ তিনি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সঙ্গে করেছিলেন। 'সঞ্জীবনী' কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনীর নামে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু শিবনাথই সে ব্যাপারে মুখ্য সহযোগী হলেন। তিনি লিখেছেন, 'সঞ্জীবনী অফিসে কৃষ্ণকুমার বাবুর পরিবারদিগকে দেখিতে গেলাম। সেখানে মুখে মুখে সঞ্জীবনীর জন্য কিছু কিছু dictate করি, কুমুদিনী লেখেন।'

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও শিবনাথের যত্নের ত্রুটি ছিল না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন, 'আজকালকার যুবকেরা জানে না যে, 'বঙ্গবাসী'র গঠনে তিনি (শিবনাথ) কতখানি বুকের রক্ত ঢালিয়াছিলেন।'[৭২] এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের প্রেরণা শিবনাথই তাঁকে প্রথম দিয়েছিলেন।

সম্পাদকের আরও একটি দায়িত্ব শিবনাথ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। সেটি হল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিনা পারিশ্রমিকে বিপুল সংখ্যায় রচনা-প্রকাশ। সাংবাদিকের ভাষায়, 'আজকালকার সম্পাদক ও লেখকগণের নিকট ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা লেখক বিনা পারিশ্রমিকে এতগুলি সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে এত প্রবন্ধ দিতে পারিয়াছেন।'[৭৩] আসলে সাংবাদিকের সত্যনিষ্ঠা ও নিস্পৃহতা এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ), পৃ. ১০৭।
২. Brahmo Year Book—1876, p. 49.
৩. Annual Report of the Indian Reform Association, 1870-71, p. 15.
৪. সোমপ্রকাশ, ১লা শ্রাবণ ১২৭৯।
৫. সুলভ সমাচার, সংবাদসার বিভাগ, ৩০শে বৈশাখ ১২৮১ সংখ্যা, পৃ. ৫২৪।
৬. ভারত সংস্কারক, ৭ই অগ্রহায়ণ ১২৮০, পৃ. ৩০৭।
৭. প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮।
৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৬৬।
৯. প্রবাসী (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়), অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ. ৩০৪।
১০. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১১৮।
১১. সোমপ্রকাশ, ৫ই জুন ১৮৬৫ সংখ্যা।
১২. সোমপ্রকাশ, বিজ্ঞাপন, ১লা পৌষ ১২৮০, পৃ. ৬১।
১৩. 'পরবর্তী ২৭শে জুলাই হইতে বিদ্যাভূষণ পুনরায় সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, ১৩৫৪, পৃ. ১৫৮।
১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১২৪।
১৫. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ভাগ, পৃ. ৯৯৬।
১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৯০।
১৭. সোমপ্রকাশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৫ই ভাদ্র ১২৯৩ সংখ্যা।
১৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১১৯-২০।
১৯. সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয়, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।
২০. তদেব, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।
২১. রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়প্রস্তাব, ৪র্থ সং ১৩৪২, পৃ. ৩০৫-৬
২২. সোমপ্রকাশ, ২রা আষাঢ় ১২৮১।
২৩. Bipin Chandra Pal, Memoirs of My Life and Times (1932), pp. 306-7.
২৪. সমদর্শী, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১২৮১, Nov. 1874.

২৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১২৬-২৭।
২৬. সমদর্শী. ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮১।
২৬ক. তদেব।
২৭. শ্রীনাথ চন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পৃ. ১৫০, পাদটীকা।
২৮. ভারত সংস্কারক, সমদর্শীর বিজ্ঞাপন, ১৮ই পৌষ ১২৮১; পৃ. ৪৩২।
২৯. সমদর্শী, মাঘ ১২৮১।
৩০. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিতকথা, পৃ. ১৮০
৩১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৩২।
৩২. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত কথা, পৃ. ১৮০।
৩৩. শ্রীনাথ চন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পৃ. ১৫০।
৩৪. হেমলতা দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্র., শিবনাথ-জীবনী, পৃ. ১৫৭।
৩৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৪৬।
৩৬. Bramo Year Book—1878, p. 48.
৩৭. এডুকেশন গেজেট, ১লা মার্চ ১৮৭৮।
৩৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৪৭।
৩৯. Bramo Year Book—1878. p. 15.
৪০. Ibid, pp. 16-17.
৪১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৪৭।
৪২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪।
৪৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৫৪।
৪৪. তত্ত্বোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮০০ শক, ৪১৯ সংখ্যা, পৃ. ৫৭-৫৮।
৪৫. Bipin Chandra Pal, Memoirs of My Life and Times, p. 345.
৪৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮০০ শক, পৃ. ৫৭-৫৮।
৪৭. এই পত্রিকায় প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'গৃহধর্ম'।
৪৮. তত্ত্বকৌমুদী, ২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা।
৪৯. তদেব, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
৫০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০১ শক, পৃ. ১৩।
৫১. প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংকলিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী', ৮৬ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১১৬-১৭। পত্র রচনার তারিখ—দার্জিলিং ৫ই আষাঢ় ৫০ ব্রাহ্মাব্দ (১৮৭৮ খ্রী)।
৫২. বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ. ৬০২।
৫৩. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৫৪।
৫৪. শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ. ২৫।
৫৫. তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৫ সংখ্যা।
৫৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ১৯৬।
৫৭. তদেব।
৫৮. শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ. ৪৮।
৫৯. মুকুল কাহাদের জন্য? মুকুল, ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০২, পৃ. ১৭।
৬০. সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

৬১. নববর্ষের সম্ভাষণ, ২য় ভাগ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৩।
৬২. 'শ্রীমান বারীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখাটি চলনসই রকমের হইয়াছে বলিয়া, তাহাকেই ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'—মুকুল, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, পৃ. ৩২।
৬৩. শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ. ৪৮।
৬৪. শিবনাথ রচিত এই ধরনের একটি জীবনী-সংকলন 'স্বনামা পুরুষ' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬৪)
৬৫. ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ-কর্তৃক 'উপকথা' নামে প্রকাশিত।
৬৬. মুকুল, মাঘ ১৩০২, পৃ. ১১৭।
৬৭. মুকুল, শ্রাবণ ১৩০৩, পৃ, ৬৩।
৬৮. মুকুল, পৌষ ১৩০৩, পৃ, ১৩০।
৬৯. মুকুল, ফাল্গুন, ১৩০৩, পৃ, ১৬৯-৭৩।
৭০. সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৭, পৃ, ৭০৪।
৭১. রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃ. ৩৪২।
৭২. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৬, স্থগিত নবম অধিবেশন, পৃ. ৬৮-৭২।
৭৩. সাংবাদিক সুধীন্দ্রকুমার লাহিড়ীর এই উক্তি জীবনময় রায় কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৪, শিবনাথ জন্মশতবার্ষিকী নামক প্রবন্ধ।

গ্রন্থরসিক শিবনাথ

একটি পাঠক কী ধরণের বইপত্র পড়েন, তা জানতে পারলে তার মানসিক গঠনের সঙ্গে পরিচিত হতে পারা যায়। বিশেষত সেই পাঠক যদি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তা হলে তাঁর পঠিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে একটা কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে। আমরা এই প্রবন্ধে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত একটি ব্যক্তির বই পড়ার পরিচয় দিয়ে তাঁর মানসিক গঠনের কিছুটা মূল্যায়নের চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার এই প্রবন্ধে আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর নিজের 'অপ্রকাশিত ডায়েরি'কে[১] (সংক্ষিপ্ততানুরোধে এই প্রবন্ধে 'অ. ডা.' হিসাবে উল্লিখিত) মুখ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছি। কাজেই প্রবন্ধটির মূল্য অন্ত প্রকারেও স্বীকৃতিযোগ্য। এ ছাড়া শিবনাথের 'আত্মচরিত' এবং 'ইংলণ্ডের ডায়েরি' শীর্ষক গ্রন্থ দুটিও আকর-গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে শিবনাথ শাস্ত্রীর বিভিন্ন পরিচয়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, অন্যধারে সমৃদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক। কবি-ঔপন্যাসিক শিবনাথের পরিচয় ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে, এ অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। তবুও প্রাবন্ধিক শিবনাথ উচ্চ শ্রেণীর পাঠকমহলে এখনও বেঁচে আছেন। আজ-ও তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়ে চলেছে।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর ঐতিহাসিক মূল্য তর্কাতীত, কালের নিরিখে তার সারবত্তা নির্ধারিত হয়ে গেছে। কিন্তু মুখ্যত এটি একটি জীবনীমালা। আর 'আত্মচরিতে', আত্মকীর্তন অপেক্ষা 'আত্ম'-কে ঘিরে যে মহাত্মারা রয়েছেন, তাঁদেরই কথা। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিবনাথ ছিলেন বহু জীবনীর রচয়িতা। নিজের জীবনে যেমন বহু ব্যক্তিকে আপন মাধুর্যে আকর্ষণ করেছিলেন, তেমনি নিজেও বহু জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বহু বিচিত্রতর গ্রন্থের একনিষ্ঠ পাঠক শিবনাথ তাই সর্বাধিক পরিমাণে জীবনী-গ্রন্থগুলির প্রতিই সমধিক আকর্ষণ বোধ করতেন। বরং বলা ভাল, জীবনী-গ্রন্থ পেলেই, তা দেশী হোক, বিদেশী হোক, শিবনাথ সাগ্রহে

পাঠ করতেন। বহুবারই তিনি তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরিতে লিখেছেন, 'Biography পড়া আমার ঘোর বাতিক। মানুষের জীবনচরিত পড়িতে আমার যত ভাল লাগে এমন আর কিছু ভাল লাগে না।'[২] অন্যত্র বলেছেন, 'জীবন চরিত পাইলেই আমার পড়িবার জন্ম ভয়ানক প্রলোভন হয়।'[৩]

গ্রন্থপরিচয়ের সুরুতেই তাই শিবনাথ-পঠিত জীবন-চরিতগুলির কোন কোনটির উল্লেখ করছি। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়; কারণ, তাঁর ডায়েরির সব খাতাগুলি যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি পঠিত সব বইয়ের হিসাব স্বয়ং পাঠক-ও রাখতে পারেন না। প্রথমে বাংলা চরিতগ্রন্থগুলির কথা বলি :

১. রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২. অদ্বৈতপ্রকাশ।
৩. দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী।
৪. দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী।
৫. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।
৬. মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত।
৭. চৈতন্যভাগবত।
৮. নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থাবলী।

ইংরাজী গ্রন্থগুলির মধ্যে :

(১) ডক্টর প্রিস্ট্‌লি, (২) দান্তে, (৩) কার্লাইল, (৪) এমার্সন, (৫) রাস্‌কিন, (৬) মর্টিমার, (৭) হার্বার্ট স্পেন্সার, (৮) জর্জ মুলার, (৯) কাউন্ট টলস্টয়, (১০) গ্রোভ্‌স, (১০) মিস কব্‌, (১১) ফরাসী লেখিকা জর্জ সণ্ড,—যাঁর আসল নাম Madame Dudevant, (১২) মিসেস সুশানা ওয়েস্‌লি, (১৩) জর্জ এলিয়ট, (১৪) লর্ড স্যাফ্‌টুবেরি, (১৫) বানিয়ানের 'পিল্‌গ্রিমস্‌ প্রগ্রেস্‌', প্রভৃতির আত্ম-জীবনীমূলক রচনাগুলি ছাড়া (১৬) কার্লাইলের Hero Worship, (১৭) The Young Man in the Battle of Life, (১৯) Lives of Saints, (১৯) St. Xavier-এর জীবনী, (১৯) Uses of Great Men, (২০) Gladstone-এর জীবনী, (২০) Savonarola, (২১) Life of Mahomet, (২২) Women Who Win—By an American, (২৩) রেনানের 'Life and Epistles of St. Paul, (২৪) টাউলারের 'Life and Sermons', প্রভৃতি জীবনী-গ্রন্থগুলিও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন।

অসমাপ্ত অথচ দীর্ঘ এই তালিকাটি দেখে আমাদের মনে হয় যে, শিবনাথ বাংলা জীবনীর তুলনায় ইংরেজী জীবনচরিত বেশী পাঠ করেছেন। এর কারণ সম্ভবত বাংলায় তখনও অধিক পরিমাণে সুপাঠ্য জীবনচরিত রচিত হয় নি। আরও মনে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নর-নারীর জীবনী পড়ার ফলে শিবনাথ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

এবারে আমি উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহের কোন কোনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বইগুলি সম্পর্কে শিবনাথ কী ধারণা পোষণ করতেন তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

বাংলা গ্রন্থ :

এক. দার্শনিক, সুবক্তা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'-টি শিবনাথ বহুবারই আদ্যোপান্ত পাঠ করেছিলেন এবং তাঁর 'History of the Brahmo Samaj'—Vol. 1-এর উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সুবিশাল এই বইটি তাঁর এত ভাল লাগত যে, একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বইটি ছেড়ে উঠতেন না। তৃতীয়বার বইটি পড়ার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আজি ৪ ঘণ্টাতে নগেন্দ্রবাবুর লিখিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতখানি সমুদয় পড়িয়া ফেলা গেল।'[৪] শিবনাথ যে কত দ্রুত গতিতে বই পড়তে পারতেন তার কথাও আমরা এই প্রসঙ্গে জানতে পারছি।

দুই. বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠে শিবনাথের গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর উপদেশাবলীতে বৈষ্ণব মহাজনদের নানা উক্তির উল্লেখ লক্ষ্য করে থাকি। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' একটি বৈষ্ণবগ্রন্থ। দীর্ঘদিন ধরে বইটি পড়তে পড়তে শিবনাথের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা তাঁর কথাতেই বলি, 'পড়িতে পড়িতে মানব-হৃদয়ের উপর চৈতন্যের শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইল। ইহাই চৈতন্যের ধর্মসম্প্রদায়ের মূল শক্তি। মনে হইল ব্রাহ্মসমাজে এই personal inspiration জন্মে নাই।'[৫] অবশ্য এর ব্যতিক্রম হিসাবে কেশবচন্দ্র সেনের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

তিন. বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' পাঠেও তাঁর মনে এই প্রকারের কথাই জেগেছিল : 'চৈতন্য-ভাগবতে ভক্তিপথাবলম্বীদিগের ব্যাকুলতা, বিনয় ও

সাধুভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি, এইগুলিই প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ; এগুলি সাধনের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।'[৬]

কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ :

এক. দান্তের জীবনচরিত শিবনাথ অন্তত তিনবার পড়েছিলেন। জব্বলপুর কলেজের অধ্যাপক মিঃ এ. সি. দত্ত-র ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে কেরী অনুবাদিত দান্তের জীবনচরিত আছে জানতে পেরে সেটি চেয়ে এনে শিবনাথ তৃতীয়বারের জন্য প'ড়ে ফেলেন। 'প্রথম যখন Dante-র জীবন পড়ি ও Divine Commedy-র কিয়দংশ পড়ি তখন এমন ভাল লাগিয়াছিল যে সেজন্য Italian শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। Beatrice-এর প্রতি Dante-র যে প্রেম তাহার বিষয়ে যখন ভাবি মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হয়।'[৭]

দুই. ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে একবার একটি গাড়ীতে ভ্রমণকালে শিবনাথ মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি 'Autobiography of Herbert Spencer' গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। বলেছেন, 'যাঁহারা নিজ চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানকে উন্নত, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া জগতে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনাতে হৃদয় মন মহৎ হয়।'[৮]

তিন. বানিয়ানের রূপকাশ্রয়ী আত্মচরিত 'Pilgrim's Progress' পাঠের অনিবার্য ফলশ্রুতি 'ছায়াময়ী-পরিণয়' নামক কাব্য রচনা।

চার. 'George Muller-এর আত্মচরিত পড়িয়া বড়ই উপকার বোধ করিতেছি।'[৯] দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে সিংহলে শিবনাথের সঙ্গে জর্জ মূলারের সাক্ষাৎকার ঘটে। 'তিনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক মিনিট মাত্র যাপন করিয়াছিলাম।...তাঁহার প্রণীত 'দি লর্ডস্ ডীলিংস্ উইথ জর্জ মূলার' নামক গ্রন্থপাঠ করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।'[১০] ইংলণ্ডে বাসকালে পুনর্বার এই গ্রন্থপাঠ ক'রে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন।[১১]

জীবনচরিত পাঠ আত্মোন্নতির সহায়ক—এই ছিল শিবনাথের প্রতীতি। আবার এই জীবনচরিত পাঠেই দেশের যুবশক্তির পুনর্জাগরণ সম্ভব, একথাও তাঁর বার বার মনে হয়েছে। তিনি স্পষ্টত অনুভব করেছিলেন, 'স্মাইল্‌স্-এর সেল্‌ফ হেল্‌প-এর ন্যায় বাঙ্‌লা বই আবশ্যক।' একারণে 'যেরকম জীবনচরিত

আলোচনার দ্বারা মানব-জীবনের মহৎভাব লোকের মনে আবদ্ধ হইতে পারে' এমন সকল জীবনচরিত কেনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন; আর ভেবেছিলেন, 'সেই সকল উপাদান হইতে অন্তত এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা অগ্নিময় অক্ষরে মনুষ্যত্বের কথা যুবক-যুবতীর মনে লিখিয়া দিবে।' 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'—শিবনাথ ছিলেন এই মন্ত্রের সাধক। সেকারণে জীবনী রচনা করতে গিয়ে জীবন-রচনার সাধনা করতে চেয়েছিলেন—'কিন্তু লেখা ও বলা অপেক্ষা এইরূপ জীবন প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন জীবন চাই, লেখা ও রচনাতে যাহার দশভাগের একভাগও প্রকাশ পাইবে না।'[১২] যথার্থই এই সাধনার সিদ্ধির অমরাবতীতে শিবনাথ স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছেন।

এতক্ষণ আমরা জীবনচরিত প্রসঙ্গে শিবনাথের নানা কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু বিদেশী উপন্যাস পাঠেও শিবনাথকে বহু সময় ব্যয় করতে দেখি। গভীর আগ্রহের সঙ্গে উপন্যাসগুলি তিনি পাঠ করতেন, মনে মনে সমালোচনা করতেন, অভিভূত হতেন, আবার স্বীয় রচনায় তার ভাবগুলি গ্রহণের জন্য নানা প্রযত্ন করতেন। তাঁর পড়া কয়েকটি উপন্যাসের নাম করি:

১. Home Influence—Miss Aquilion.

২. Mother's Recompense—Acquilbar.

৩. To Right, the Wrong—Edna Lyall.

৪. Margaret Dent.

৫. Holy Order.

৬. Lady Rose's Daughter—Mrs. Humphrey Ward ইত্যাদি।

Edna Layall-এর উপন্যাসটি তাঁর ভাল লাগেনি। 'পড়িতে মনে হয় খাড়া তারা দিয়া গল্পটা সাজাইতেছে; তদ্ভিন্ন লেখিকার মাথাতে কতকগুলি বিশেষ ভাব আছে, সেগুলি যেখানে সেখানে দেখা দিতেছে।'[১৩] আবার Mrs. Acqulion-এর উপন্যাসের পারিবারিক দৃশ্য শিবনাথকে এতই অভিভূত করেছিল যে, 'এই গ্রন্থ পড়িবার সময়' তিনি 'কোনও কোনও স্থানে কেঁদে'[১৪] ফেলেছিলেন। 'Lady Rose's Daughter-এর শিবনাথ কৃত পর্যালোচনামূলক সমালোচনাটি তুলে দিই: 'Jaeod Delafield কিরূপে Julie-কে Paris হইতে পাকড়াইয়া আনিল, তাহা মনে হইলে হাসি পায়। এক শ্রেণীর মেয়ে আছে,

জোয়ান পুরুষদের হাতে পড়া তাহাদের পক্ষে বাঁচিবার একটা মস্ত উপায়। Julie সেই শ্রেণীর মেয়ে। স্বাধীনতার অভিমান ও স্বাধীনতার ইচ্ছাটা খুব আছে, অথচ স্বাধীনতাকে বাঁচাইয়া চলিবার শক্তি নাই, এই শ্রেণীর মেয়ের মুখে লাগাম দিবার লোক থাকা আবশ্যক। Jaeod Delafield সেই লাগাম দিবার লোক, Julie-র মুখে লাগাম দিয়া তবে ছাড়িল, ধন্য ছেলে। আমি এরূপ পুরুষ ভালবাসি।'[১৫] প্রসঙ্গত শিবনাথের অত্যধিক পড়ার বাতিকের জন্য তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী স্বামীর চোখের অবস্থা ভেবে খুবই অনুযোগ করতেন।

কিন্তু তাঁর মনে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল থ্যাকারে প্রণীত উপন্যাস-গুলি। থ্যাকারের ইংরাজী রচনার ভঙ্গি এবং ইংরাজী শব্দচয়ন শিবনাথের এত ভাল লাগত যে, যখনই তিনি কোন ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করতেন, ঠিক তার আগেই থ্যাকারের কোন বই প'ড়ে নিতেন ; বলেছেন, 'প্রাণটা ভাল ইংরেজীতে অভ্যস্ত করিবার জন্য তাঁর লেখা পড়ি।...বিশেষত Thackery-র Novel-গুলি আমার বড় মিষ্ট লাগে।'[১৬] থ্যাকারে রচিত 'Pendennis' উপন্যাস পাঠ করে শিবনাথ এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, চোখের জল বাঁধ মানে নি। 'Haleu Pen-dennis-এর মৃত্যুর বিবরণটা যেখানে আছে সেখানে কাঁদিয়া ফেলিলাম।'[১৭]

বাংলাদেশে উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করে যাঁরা উত্তরকালে খ্যাতিমান হয়েছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সে সময়ে প্রচারিত পশ্চিমদেশীয় নানা মতবাদের সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করতেন। বিশেষ ক'রে স্পেন্সার, মিল, কোঁৎ ইত্যাদিদের দর্শন প্রাচ্যদেশে যথেষ্ট মাত্রায় চর্চা করা হয়েছিল। শিবনাথ ব্যক্তিগতভাবে এই মত-গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থপাঠ করেছিলেন। স্পেন্সারের কথা পূর্বেই বলেছি। হিতবাদ দর্শনের প্রবক্তা স্টুয়ার্ট মিল-এর 'Liberty' এবং 'Three Essays on Religion' গ্রন্থদ্বয় শিবনাথ গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলেন।

প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘায়িত হবে ভেবে এবারে শিবনাথ-পঠিত ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-নীতি-মূলক গ্রন্থগুলির উল্লেখমাত্র করছি :

সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থসমূহ :

(১) সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ব্যাকরণ, (২) রঘুবংশ, (৩) শ্রীমদ্ভাগবত, (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৫) আর্যবিদ্যাসুধাকর, (৬) ভবভূতির মালতীমাধব, (৭) কালী-

প্রসন্ন সিংহের মহাভারত (৮) নলোপাখ্যান (৯) ভক্তিতত্ত্বসার (১০) বিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি।

ইংরেজি গ্রন্থ :

এমার্সন রচিত 'Essays', ফ্রেডারিক হ্যারিসনের 'The Ghost of Religion', ডাল্টনের 'Ethnology of Bengal', রীজ ডেভিসের 'Buddhism', জোসেফ কুকের 'Biology', 'আবেস্তা', ফাদার নিউম্যানের 'Apologia Vita Sua', পার্কারের 'Love and the Affection', টডের 'Annals of Rajasthan', ব্রাদার লরেন্সের 'The Practice of the Presence of God', ফাদার সাউদওয়েলের 'Hundred Meditations', জার্মান দার্শনিক উইলিয়ম হারমানের 'The Communion of the Christian with God', এভেলিন আণ্ডারহিলের 'The Mystic Way', ডক্টর ওয়ার্ডের 'Naturalism and Agonisticism' ও 'Realms of Ends', জন ফিস্কে রচিত 'Cosmic Theism', টমাস্ এ কেম্পিসের 'Imitation ofChrist', 'Theologica Germannica', সুইডেনবার্গের 'Divine Providence', ফারারের 'The Seekers after God', রামমোহনের সব গ্রন্থাদি, কেয়ার্ডের 'Philosophy of Religion,' মার্টিনোর 'Study of Religion', ম্যাক্সমূলারের 'Hibert Lectures'-গুলি। সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল ডেভিড্ রচিত 'Psalms'-গুলি এবং পার্কারের উপদেশাবলী। পার্কারের Ten Sermons শিবনাথ বার বার উল্লেখ করেছেন। 'পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল'।[১৮] অন্যত্র : 'আমার ধর্মজীবনের প্রারম্ভে অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের সময় এই প্রার্থনাগুলি আমাকে জীবন দিয়াছিল।'[১৯] তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। কিন্তু বইগুলির বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। সেই সূত্রে আমাদের এই পাঠকটি যে কতখানি 'সিরিয়স্' এবং গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা' ধারণা করতেও কোন কষ্ট হয় না।

বইপড়া যাঁদের নেশা হয়, পুরান বই-এর দোকান আর গ্রন্থাগারগুলি তাঁদের বিচরণক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। শিবনাথকেও এই ব্যাধিকে পেয়ে বসেছিল। স্বদেশের Imperial Library প্রভৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ব্যতীত পরিচিত ব্যক্তিগণের সংগ্রহগুলি ব্যবহারে শিবনাথ ছিলেন নিরলস। ইংলণ্ডে গিয়ে অন্যান্য কর্মে ব্য

মধ্যে তাঁর প্রধান কাজ ছিল, গ্রন্থালয়গুলি পরিদর্শন করা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্তালয়ের সুবিখ্যাত 'বড্‌লিয়ান লাইব্রেরী' তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সভ্য হওয়ার পর তিনি লিখেছেন, 'উঃ কি লাইব্রেরীই করিয়াছে! এই ত পড়িবার স্থান। কতলোক বসিয়া পড়িতেছে, দেখিলে উৎসাহ হয়; একটি বিত্তার হাওয়া যেন বহিতেছে!'[২০]

১৯৮৬ সালে শিবনাথের মহাপ্রয়াণের সাতবট্টি বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই প্রবন্ধ রচনা ক'রে তাঁর স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. এই অপ্রকাশিত ডায়েরি দেখতে দিয়ে ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র মহাশয় আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।
২. অ. ডা, ১১. ৭. ১৯০৪
৩. তদেব, ১. ১১. ১৯০১
৪. তদেব, ২৭. ৪. ১৮৮৪
৫. তদেব, ২. ৬. ১৯০৯
৬. তদেব, ২৯. ৯. ১৯১১
৭. তদেব, ১. ১১. ১৯০১
৮. তদেব, ২১. ৭. ১৯০৪
৯. তদেব, ১৪. ৫. ১৯০৯
১০. আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ) পৃ. ২৪৯
১১. ইংলণ্ডের ডায়েরি পৃ. ১৮৩
১২. তদেব, পৃ. ১৬৯-৭০
১৩. অ. ডা, ৮. ৬. ১৯০৮
১৪. তদেব, ১৭. ৬. ১৯০৯
১৫. তদেব, ২২. ৯. ১৯০৩
১৬. তদেব, ১. ৯. ১৯০৩
১৭. তদেব, ২০. ১০. ১৯০৩
১৮. আত্মচরিত পৃ. ৬৮
১৯. অ. ডা, ২৯. ৭. ১৯১৩
২০. ইংলণ্ডের ডায়েরি পৃ.-৮৫

বিলাতী পত্রিকায় মেজবউ

একটা ভাষার সাহিত্য কতোখানি উন্নত হয়েছে বোঝা যায় তখন, যখন দেখি সেই বিশেষ দেশের নানা গ্রন্থ বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়ে চলেছে। বাংলা ভাষার স্থান সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর ভাষা সমূহের কোন পর্যায়ে পড়ে, সে পরিসংখ্যান নিয়ে বসলে হয়তো সাহিত্যের হিসেবে ভুল হয়ে যাবে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে বাংলার একটা স্থান অবশ্যই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি না, কারণ সেটা একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তো সারা বিশ্বে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যজগৎ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর পূর্বে এবং পরেও বাংলা সাহিত্যের নানা গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্য সমাজে একটা স্থান করে নিতে পেরেছে। এর ইতিহাস দীর্ঘ—সেই কাশীপ্রসাদ-শশিচন্দ্রদের কাল থেকে বরেন বসু-ভবানী ভট্টাচার্য-প্রীতীশ নন্দীদের কাল পর্যন্ত। সে সবের হিসেব নিতে গেলে অন্য বই লিখতে বসতে হয় এবং সে বই নিঃসন্দেহে বহু ললাট যন্ত্রণার কারণ হবে। আমাদের হিসেব আপাতত রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের অনুবাদ নিয়ে। সে হিসেবও আবার নিতান্ত মোটা—অনেকটা জাবদা খাতার কপাল-টুকির মতো। কিন্তু এই হিসেবের একটা জায়গায় আমরা থমকে দাঁড়াতে চাই, কারণ তাই নিয়েই আমাদের খেরোর খাতার জমার প্রথম অঙ্কপাত সুরু হবে।

বাঙালীর ছেলে ইংরেজিতে কবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন, প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন, নক্সা রচনা করেছেন, সে সেই গত শতাব্দীর তিন দশক থেকেই প্রায়। কাশীপ্রসাদ ঘোষের কথা প্রথমেই সবার মনে এসে থাকে। কারণ তিনিই প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী যিনি ইংরেজিতে কবিতা-লেখার মতো একটা দুঃসাহসিক প্রয়াস দেখিয়েছিলেন ১৮৩০ সালেই। বয়স তখন তাঁর মাত্র একুশ—ভরাভর যৌবন। তাঁর ঐ Shair and Other Poems-এর কথা ছেড়ে দিলে শশিচন্দ্র দত্তের কথা মনে আসবে। তাঁর 'টাইম্‌স অব ইয়োর' গল্পমালা ইংরেজিতে লেখা এবং ইংরেজি ইতিহাস আখ্যান 'অ্যানালস এণ্ড এন্টিকুইটিস্ অব রাজস্থান' থেকে চয়ন করা। হ্যাঁ, কর্নেল টডের সেই বিখ্যাত কাহিনী থেকেই। শশিচন্দ্র নিজেই এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন। রামবাগান দত্ত পরিবারের

এই বংশের গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কথাও কারও কারও মনে পড়বে। তিনি ঐ শশিচন্দ্রের অনুজ তো বটেনই, কিন্তু তাঁর গৌরব অন্য কারণেও। তিনি তরু দত্তের পিতা। তরু দত্তের ইংরেজি কাব্যচর্চায় সঙ্গে ফরাসী কাব্যচর্চাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এই বংশের ছেলে রমেশচন্দ্র দত্ত-ও, যাঁর মেজ ভাই যোগেশচন্দ্র ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। রমেশচন্দ্র নিজেই নিজের 'সংসার' উপন্যাসটির একটি ইংরেজি অনুবাদ লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেছিলেন ১৯০২ সালে The Lake of Palms নামে। লালবিহারী দে-র 'গোবিন্দ সামন্ত' তো বঙ্গীয় পাঠককুলের অতি পরিচিত গ্রন্থ।

কিন্তু এ-সব গেল কবিতা-গল্পের গল্প। উপন্যাসের অনুবাদ? তা-ও হয়েছিল বই কি? হিন্দু-কলেজের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর থেকে প্রথম স্নাতক হয়ে বেরিয়ে এসেছেন যদুনাথ বসু আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেশির ভাগ পণ্ডিতের মতে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস। অবশ্য এক হিসেবে ইংরেজিতে লেখা হলেও তাঁর Rajmohan's Wife (কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড্' পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত) তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। দুটো ঘড়ির সময় যেমন কখনো এক হয় না, দুজন ডাক্তারও যেমন সাধারণতঃ একই প্রকার চিকিৎসা করেন না, তেমনি দুজন পণ্ডিতের মধ্যেও ঐক্য কম পরিলক্ষিত হয়। একদল যদি বলেন, বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস, অন্য দল বলে বসেন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল'। তর্ক করেন আর সমর্থনের জন্য ঢাউস ঢাউস সাহিত্য সমালোচনার বই খুলে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। আরো পুরানো মতবাদিগণ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পেরিয়ে ভবানী চরণে আত্মসমর্পণ করেন। আমাদের হিসেব তাদের নিয়ে নয়। ভূদেব-ভবানীর বই ইংরেজিতে সেকালে অনূদিত হয়নি। হয়েছিল প্যারীচাঁদ-বঙ্কিমের বই। শুধু ওঁদেরই নয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখদের বইও ইংরেজি (এই প্রবন্ধে মাত্র ইংরেজি অনুবাদের কথা, অন্য ভাষায় নয়, আলোচিত হয়েছে) ভাষায় অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। প্রথমে বঙ্কিমের কিছু উদাহরণ নিই। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'কে চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Durgesa Nandini; Or The Chieftan's Daughter' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন ১৮৮০ সালে। বিষবৃক্ষ—The Poison Tree নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়

১৮৮৪-তে। ঐ লণ্ডন থেকে আরও এগারো বছর পর তাঁর 'Krishna Kanta's Will' বেরোল। যুগলাঙ্গুরীয় প্রকাশ করলেন রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে—এমনি আরও তাঁর বই সব। এই যে সব বইয়ের নাম করলাম এর মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর 'সম্মান' বেশি। 'সম্মান', কারণ এর অনুবাদ এদেশের লোকেরা করেননি, করেছেন এক বিদেশী ভদ্রমহিলা। একটা কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে বিদেশীরা যদি অন্য দেশের বইয়ের অনুবাদ করেন, তার কদর অনেক বেড়ে যায়। ঐ দুটি বই যিনি অনুবাদ করেছিলেন তিনি মিসেস মিরিয়ম এস. নাইট (Miriam S. Knight). বিষবৃক্ষের অনুবাদের ভূমিকা লিখেছিলেন সুবিখ্যাত এডুইন আর্নল্ড আর কৃষ্ণকান্তের উইলের ভূমিকা, নির্দেশিকা এবং টীকা রচনা করেছিলেন Mr. J. F. Blumhardt, M.A. পাঠকের মনে প্রশ্ন জেগেছে কে এই মিসেস নাইট? ইনি অবশ্য মিসেস জে. বি. নাইট নামেও সমধিক পরিচিত। এঁরা স্বামী-স্ত্রী বেশির ভাগ সময় লণ্ডনে বাস করলেও মনে প্রাণে ভারতীয় ছিলেন। আরও স্পষ্ট করলে তাঁদের বঙ্গবন্ধু বলাও চলে। এঁদের বাড়ী থেকেই রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র ও গিরিশচন্দ্র মিত্রের পৌত্র ব্যারিস্টারি পড়বার সময় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' অনুবাদ করে বিলাতেরই এক জার্নালে প্রকাশ করেন। তাঁকে অনুবাদ কালে সহায়তা করেন ঐ মিরিয়ম নাইট। মিসেস নাইট ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পাবলীরও অনুবাদ করেছিলেন। 'ষোড়শী' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় প্রভাতকুমার লিখেছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদকর্ত্রী, শ্রীমতী এম. এস. নাইট মহাশয়া এই গ্রন্থের কতিপয় গল্প ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিলাতী মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।' শুধু এই বইটির গল্প নয়, প্রভাতকুমারের 'Stories of Bengal Life' বইটিও তাঁদের যৌথ অনুবাদের মাধ্যমে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র (১৮৭৪) অনুবাদও প্রকাশ করেছিলেন মিসেস নাইট তাঁর পত্রিকায়।

এখন ঐ পত্রিকাটির নাম জানাই। পত্রিকাটির নাম 'Journal of the National Indian Association', লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ' উপন্যাসের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পাঠক নিশ্চয়ই কৌতূহলী

হয়ে পড়ছেন, কোন্ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা জানবার জন্যে। তাহলে আবার সাল তারিখের হিসেব নিয়ে পড়তে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রথম অনুবাদ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-তে। সেটি একেবারে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য মিসেস নাইট তাঁর 'সুবর্ণ গোলক' রসরচনাটি লণ্ডনের 'The Indian Magazine and Review' পত্রিকার মার্চ ১৮৯৬ সালে অনুবাদপূর্বক প্রকাশ করেন। প্রভাতকুমারের অনুবাদ প্রকাশিত হয় অনেক পরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে, তাও কলকাতা থেকে, খোদ লণ্ডনে নয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতার অনুবাদ মিসেস নাইট ঐ 'জার্নাল'-এ প্রকাশ করেন ১৮৮৩-৮৪ সালে। এ-সবের আগেও ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ঐ পত্রিকায় প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রাগুক্ত উপন্যাস দুটি ধারাবাহিকভাবে মিরিয়ম নাইট অনুবাদান্তে প্রকাশ করেন। এতক্ষণে আমরা আমাদের বক্তব্যের একটা নিজস্ব জমি পেলাম। এতগুলি অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন অনুবাদ হ'ল এ দুটি এবং দুটিই লণ্ডনের মাটিতে প্রথম পত্রস্থ।

কিন্তু কোন্‌টি সর্বপ্রথম ? এবার ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টাতে হবে। প্যারি-চাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' Journal of The National Indian Association-এর ১৩৯ থেকে ১৪৮ সংখ্যা (১৮৮২-৮৩) পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে 'The Spoilt Boy' নামে। কিন্তু এরও আগে ঐ পত্রিকার পৃষ্ঠায় অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' ১৩৯ সংখ্যা, অর্থাৎ জুলাই ১৮৮২ সংখ্যা থেকে ধারাবহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এর আগে জানুয়ারি ১৮৮২ তারিখের সংখ্যা থেকে মে মাস (একই বছরের) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত 'মেজ বউ' উপন্যাসটি। সুতরাং একবার সাহস করে এবার উচ্চারণ করি, বিলাতী পত্রিকায় প্রথম যে বাঙলা উপন্যাসটি অনুবাদের মাধ্যমে স্থান করে নিল, সেটির নাম 'মেজবউ'।

শুধু কি তাই, আলালের ঘরের দুলালের অনুবাদক মুখ্যতঃ একজন বাঙালী। অবশ্য তিনি যে ইংরেজ মহিলার সাহায্য নিয়েছিলেন তিনিই সমগ্রতঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ'-কে স্বয়ং অনুবাদ করেন। এটাও একটা গৌরব নিশ্চয়ই। মিসেস জে. বি. নাইট বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন, পরিচিত ছিলেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের

সত্ত্বেও। কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে ইংলণ্ডের সাহিত্য আসরে 'মেজবউ'-কে (এবং অন্যান্য রচনাকেও) একটা সম্মানজনক স্থান দিয়ে তিনি বাঙালীর সম্মানিত ও চিরস্থায়ী বন্ধু হয়ে গেলেন। এখন কি পাঠক 'মেজবউ' সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হচ্ছেন না? এর রচনার ইতিহাস লেখকের বকলমেই শুনি। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শিবনাথ ভারতের পশ্চিমাংশে প্রচারের জন্য বহির্গত হন এবং পথিমধ্যে পরম বন্ধু বাঁকিপুর নিবাসী প্রকাশচন্দ্র রায়ের পত্নী অঘোরকামিনী দেবীর (এঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জনক-জননী) আতিথ্যে পক্ষকাল অতিবাহিত করেন—"এই কালের মধ্যে একটা কাজ সারা গেল। ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে পূরণ করিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে 'মেজবউ' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।" শুধুই কি প্রতিশ্রুতি? শিবনাথের কন্যা হেমলতা দেবী আমাদের জানিয়েছেন, এ সময়ে তাঁর পিতা প্রবল আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্থাভাব মিটেছিল কিছুটা এই উপন্যাসটি রচনা করে। সে সময়ে 'মেরী কার্পেণ্টার সিরিজ' নামে একটি গ্রন্থমালার প্রকাশ আরম্ভ হয়েছিল। ভারতবন্ধু মেরী কার্পেণ্টার (রামমোহনের সেই বিখ্যাত জীবনীর লেখিকা) ছিলেন জাতীয় ভারতসভা বা ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের স্থাপয়িত্রী। তিনি মারা গেলে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য বাংলা সাহিত্যে এই অভিনব সিরিজ প্রবর্তিত হয়। অভিনব কারণ এই সিরিজের গ্রন্থাবলী বঙ্গকুল-যুবতীগণের পাঠের জন্যই প্রধানত নির্দিষ্ট হয়েছিল। মিস কার্পেণ্টারের মৃত্যুর পর এই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গশাখার অবৈতনিক সম্পাদক হন মনোমোহন ঘোষ এবং আমাদের পূর্বোক্ত মিরিয়ম এস. নাইট।

একটা ব্যাপারে পাঠক একটু সতর্ক হবেন—শিবনাথ লিখিত এই উপন্যাস 'মেরী কার্পেণ্টার সিরিজে' প্রথম যখন প্রকাশিত হল (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) তখন তা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হল। এবং তারপর সেই দুর্লভ সম্মান। ইংরেজ সেই ভদ্রমহিলা অচিরাৎ বিলাতের পত্রিকাটিতে এর অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন এবং জানুয়ারি-মে ১৮৮২ সংখ্যাগুলিতে এর অনুবাদ প্রকাশ হয়ে গেল। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস বিলাতের পত্রিকায় ইংলণ্ডীয় রমণী কর্তৃক প্রথম অনুবাদিত হয়ে নিজেই ইতিহাস হয়ে গেল।

বিদেশে শুধু নয়, স্বদেশেও ইতিহাস। শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে। এই কালের মধ্যে গ্রন্থটির উনিশটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়—কখনও বা বছরে দুবার। খোদ বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো উপন্যাসের সংস্করণ এক বছরের মধ্যে কখনও ফুরিয়ে যেত না। অর্থাভাবের প্ররোচনায় এমন অনবদ্য সৃষ্টির ইতিহাস বুঝিবা সর্বকালে দুর্লভ।

বুঝেছি জিজ্ঞাসা করছেন, কী আছে বইটিতে, যার ফলে স্বদেশে-বিদেশে এই জনপ্রিয়তা? আছে, আছে। গল্পটা অবশ্য তেমন আহামরি গোছের নয়—পাঁচভাইয়ের সংসারে বোজগেরে স্বামীর উদারচিত্তা কর্মকুশলা জ্ঞানবতী বধূ প্রমদাকে কেন্দ্র করে এর গল্পের ঠাসবুনুনি। আর পাঁচটা সংসারের মতই এতে পরিবারের বাড়বাড়ন্ত এবং ক্ষয়, আনন্দ এবং অসুস্থতা, জন্ম এবং মৃত্যু এসে কাহিনীতে আলো-ছায়ার জাল বুনেছে। কিন্তু আশ্চর্য এর রচনাশৈলী।

সেকালের শিক্ষক শিবনাথ

সরস্বতীর ভাবপ্রসাদ ও স্বভাবকর্মীর কর্মৈষণা আপন জীবনে একীভূত হওয়ায় শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের সেবা ব্যতীত সমাজের বিভিন্নমুখী কর্মব্রত উদ্‌যাপনে সফলকাম হয়েছিলেন। সমাজের বহুবিধ প্রগতির সঙ্গে আপনাকে জড়িত রেখে তিনি মানব সমাজের সেবা করে গিয়েছেন।

আচার্য শাস্ত্রীর এই সেবা প্রবৃত্তি প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে,—এক, শিক্ষাক্ষেত্রে ; দুই, সমাজসেবায় ও তিন, দেশপ্রেম তথা রাজনীতিতে।

শিক্ষা বিষয়ে পণ্ডিত শাস্ত্রীর কর্মপদ্ধতি ছিল দ্বিশাখাবলম্বী। প্রথম শিক্ষক হিসাবে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা ; দ্বিতীয়, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও দান।

২

আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়ের গণ্ডী তখনও শিবনাথ পার হননি ; অর্থাৎ ন' বছর বয়স হওয়ার আগেই শিবনাথের প্রথম শিক্ষকতা শুরু হয়। তাঁর পিতার সম্পর্কিত এক খুড়ী, গৌরাঙ্গী বিধবা এক যুবতী শিবনাথের প্রথম ছাত্রী।[১] মাস্টারমশায়ের চেয়ে ছাত্রী 'পাঁচগুণে সে বড়।' ক্ষুদে মাস্টারমশাইটি ছাত্রীকে বর্ণ পরিচয় করাতেন।

দ্বিতীয়া ছাত্রী বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের ভাগ্নী মহালক্ষ্মী।[২] ছাত্রীর সঙ্গে শিবনাথ ধর্মবিষয়ক আলোচনার ফাঁকে বাংলা ও ইংরাজী পড়াতেন। শিবনাথের বয়স তখন কতই বা—বছর একুশেক। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের কথা, মাস্টারমশাইটি তখনও এল-এ পরীক্ষা দেননি। তাছাড়া কলকাতা থেকে স্বগ্রাম মজিলপুরে যখন গরম বা শীতের ছুটির সময় বাড়ী যেতেন, তখন গ্রামের পাঠশালাতেও, মাঝে মাঝে পড়াতে যেতেন।[৩]

এখনও পর্যন্ত শিবনাথ বৃত্তিধারী মাস্টারমশাই হয়ে ওঠেননি। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে এম-এ পাশ করে ও শাস্ত্রী উপাধি পেয়ে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চাকরিতে ঢুকলেন। মাইনের টাকা দুটো আঙুলে গুণলেই শেষ হয়ে যায়। আশ্রমবাসিনী মহিলাদের মধ্যে কেশব-পত্নী জগন্মোহিনী

দেবীকেও ছাত্রী হিসাবে পেলেন।[8] বয়স্কা ছাত্রী মাস্টারমশায়ের পড়ানোতে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে স্বামী পড়ার ব্যাপারে নাক গলাতে এলে আমলই দিতেন না।

কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল মাতুলালয় হরিনাভি। মাতুলের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদনা ব্যাপারে হরিনাভিতে গিয়ে সেখানকার বিদ্যালয়ের 'সম্পাদক' ও 'হেডমাস্টার' হয়ে গেলেন। বছর দেড়েক সেখানে চাকরি করলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ঢেলে সাজাবার নানা যত্ন নিয়েছিলেন। বেতনহারের সংশোধন ও বিদ্যালয়ের নৈতিক আবহাওয়া শুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাঁর প্রাণ পর্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে উঠেছিল।[৫] ঐ বিদ্যালয়ের এক মাস্টারমশাই যাত্রাদলে সঙ সাজতেন। আপত্তি করতে গিয়ে মামলায় পর্যন্ত জড়িয়ে গেলেন শিবনাথ। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরোধীদলকে আদর্শের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল। কিন্তু শিবনাথের স্বাস্থ্য গেল ভেঙে। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হরিনাভি থেকে ভবানীপুরে চলে এলেন শিবনাথ।

তৎকালীন ডেপুটি ইনস্পেকটর অফ স্কুলস্ রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শিবনাথকে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান স্কুলের হেডমাস্টার করে নিয়ে আসেন। পুরো দুটো বছর এখানে চাকরি করলেন। এই সময়ে কেশব-বিরোধী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথও এর দলে ভিড়ে গেলেন। নিজের বড় মেয়ে হেমলতাকে এই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। পরে বিদ্যালয়টি 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নাম গ্রহণ করে এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে বেথুন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে হেয়ার স্কুলে হেড পণ্ডিত কাম-ট্রানস্লেটর মাস্টারের পদ সৃষ্টি হতে শিবনাথ ভবানীপুর থেকে ঐ পদ গ্রহণ করে হেয়ার স্কুলে আসেন। এখানেও দু বছর চাকরি করেন। কিন্তু ধর্মরাজ্যের বৃহত্তর আহ্বানে তিনি শিক্ষকতা কর্মে আর থাকতে চাইলেন না। সর্বোপরি তাঁর স্বাধীনতাবোধ সরকারী কর্ম পরিত্যাগের জন্য যেন বার বার তাগাদা দিচ্ছিল। সুতরাং সাংসারিক অনটন সত্ত্বেও সকলের নিষেধ গ্রাহ্য না করে তিনি ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে "বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করে মহাকর্মের আবর্তে পড়লেন।[৬] স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা-বৃত্তির এখানেই শেষ। অবশ্য সারা জীবনই তিনি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত

থেকে তিনি সেই সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।

চাকরি ছেড়ে দিলেও একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নানা আন্দোলনে লিপ্ত থাকায় তা করে উঠতে পারেন নি। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটা সুযোগ এল। আনন্দমোহন বসু এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থানুকূল্যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষকতায় ও শিবনাথের সাক্ষাৎ দায়িত্বে সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হয়। 'প্রথম মাসেই ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইল।' দলে দলে ছাত্র ভর্তি হতে থাকে। শিবনাথের নামেই স্কুলের সুনাম। নিজে শিক্ষকতাও করতে লাগলেন।[৭] বহু ছাত্র ভর্তি হওয়ার দরুন অন্য কলেজ থেকে বহু বিতাড়িত ও অভব্য ছাত্রও এসে গেল। অথচ বিদ্যালয়টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, 'বালকদিগের প্রাণে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের নীতি শিক্ষা দেওয়া।' চরিত্রবান শিবনাথ ছাত্র বাছাই-এর কাজে দুরন্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে শহরের অন্যান্য বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এ সম্পর্কে শিবনাথের মতটি যথার্থই গ্রহণযোগ্য—'এক শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকদের মধ্যে আত্মীয়তা ও যোগ না থাকিলে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য না থাকিলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই দুইটিরই অভাব।'

সিটি স্কুল স্থাপনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। কারণ ধর্মবিহীন শিক্ষার অসারতা শিবনাথ জানতেন। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়েও ছাত্রীদের তিনি নীতি শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া একটি ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। আনন্দমোহন বসু এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ২৭-এ এপ্রিল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে সিটি স্কুলের ঘরে ছাত্রসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দমোহন বসু, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ নিজে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখেরা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। শিবনাথ অচিরে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে পরিচিত হন।[৮] এমন কি বিরোধীরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেতেন বক্তৃতা শুনে।[৯] ছাত্ররা হতেন অভিভূত।[১০] ধর্ম-শিক্ষার জন্য অন্য প্রতিষ্ঠান না থাকায় ছাত্রসমাজের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল।

সখা পত্রিকার সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন প্রতিষ্ঠিত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়েও শিবনাথ উপদেশাদি দিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের কয়েকজন কন্যার[১১] উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের শিবনাথ উৎসাহদাতা ও নীতিশিক্ষক ছিলেন।[১২]

৪

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ডে যান। সেখানকার শিশু বিদ্যালয়গুলি তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। এমনিতে শিশুশিক্ষা ব্যাপারে তাঁর বরাবরই কৌতূহল ছিল। হরিনাভি ও ভবানীপুরে যখন ছিলেন, তখন নীচু ক্লাসের ছাত্রদের 'ভুলাইয়া পড়াইবার' উপদেশ দিতেন। ইংলণ্ডের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী ব্যতীত কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 'আত্মচরিত'-এ তিনি স্পষ্টতই লিখেছেন, শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময় কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষা প্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলাম।' দেশে ফিরেই ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ মে তারিখে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করেন ব্রাহ্মপাড়ার শিশুদের জন্য। আনন্দমোহনের হস্ত এবারেও সহযোগিতায় প্রসারিত হল। বিদ্যালয়টির নামকরণ প্রসঙ্গে শিবনাথ বলেছেন, 'জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা শিক্ষালয় স্থাপন করিব, বিদ্যালয় নাম রাখিব না —আমরা প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, পুঁথিগত বিদ্যালয়, সুতরাং চেয়ার টেবিলের আবশ্যকতা কি ? আমাদের বালিকারা মাদুর পাতিয়া পড়িবে, তাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।'[১৩] এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এদেশে কিণ্ডারগার্টেন ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ হিসাবে শিবনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিবনাথ এতই চিন্তাপূর্ণ থাকতেন যে, ডালের বদলে জল দিয়ে ভাত মাখতেন কোন কোন দিন।[১৪] শিবনাথ নিজে সর্ব নিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডে ছবি এঁকে গল্পচ্ছলে পড়াতেন। ছেলেরা তাঁর সম্পর্কে এতই নির্ভর ছিল যে, শিবনাথের ক্লাসের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।

স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে শিবনাথের একটা নিজস্ব মত ছিল।[১৫] তিনি মেয়েদের

জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিক্‌স্ পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন।[১৬] এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘোর মতান্তর ঘটে, যখন তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, সেই সময়। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়েও সেই মতান্তর দেখা দেয়। শিবনাথ বিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চাননি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের স্বাধীন চিন্তা বিকাশে বাধা ঘটাবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করলে শিবনাথ এর সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করেন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কোয়েটা থেকে শিবনাথ বাঁকিপুরে প্রচার কার্যে আসেন। স্টেশনে অনেকগুলি এম. এ-কে উপস্থিত দেখে গুরুদাস চক্রবর্তী একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। স্টেশন থেকে এসেই শাস্ত্রী মহাশয় একটি 'চমৎকার প্রস্পেকটাস' রচনা করে ফেলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমৃত্যু তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৫

শিক্ষা সম্পর্কে শিবনাথের কতকগুলি ব্যক্তিগত ধারণা গড়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ শিশু এবং মহিলাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে শিশুদের শাস্তিদান তিনি পছন্দ করতেন না। অন্তরে তাঁর একটি শিশু মন বাস করত। অতি সহজেই শিশুদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাঁদের শিক্ষণীয় বিষয়টি নিপুণভাবে শিখিয়ে দিতেন। তিনি এমন আশ্চর্যভাবে ক্রীড়াচ্ছলে সকল বালককে পড়া শিখিয়ে দিতেন যে, তারা বলত, পণ্ডিত মশাই তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।'[১৭] শিশুদের শিক্ষণীয় গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি যে কত চিন্তাশীল ছিলেন নিচের উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে সেকথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শিবনাথ লিখেছেন, 'বর্তমান সময়ে শিশুদের পাঠোপযোগী বাংলা সাহিত্যের বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদের শিক্ষোপযোগী প্রণালীও নাই। এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণবিহীন পাঠ্যবিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকদের ভ্রূকুটি ও বেত্রাঘাত উহার মধ্যে নির্বাক শিশুরা ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভার লইলে মনুষ্য গর্দভ না হইয়া থাকিতে পারে না। শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত

বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে।'

'...শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার সময় দুইটি কথা স্মরণ রাখা উচিত (১) পাঠ্যবিষয়গুলি যেন তাহাদের আমোদজনক হয়, (২) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে। দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনাশক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভালবাসে ; সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বর্ণনা, বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারা যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়।'[১৮]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ ; কিন্তু এটি শিশুশিক্ষা সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ। আর এ কারণেই শিবনাথ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় এতো মনোযোগী হয়েছিলেন। 'সখা', 'মুকুল' পত্রিকার পৃষ্ঠা খুললেই শিবনাথের শিশুসাহিত্যের মিষ্টস্বাদ আস্বাদন করা যায়।[১৯] বর্তমান শিক্ষা জগতের ধারকেরা একবার এ মন্তব্য বিবেচনা করলে গর্দভ-নির্মাণের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

ভারত আশ্রমের ছাত্রীদের তিনি মুখে মুখে মেণ্টাল সায়েন্স ও লজিক বিষয়ে উপদেশ দিতেন।[২০] ছাত্রীরা সেগুলি নোট করে নিতেন।[২১] এঁদের পড়াতে শিবনাথের আনন্দের সীমা থাকত না।

শিক্ষার পাঠক্রম যাই হোক, তার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি যুক্ত না থাকলে শিক্ষা পূর্ণ হয় না, এই ধারণাকে শিবনাথ বরাবর পোষণ করে এসেছেন। সে কারণে যেখানেই ধর্মযুক্ত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হত, সেখানে শিবনাথের উৎসাহের অন্ত থাকত না। সেদিক থেকে বলা যায় শিক্ষকতা-বৃত্তি তাঁর ধর্মজীবনের একাংশকেই উজ্জ্বল করেছিল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ ১৩৫৯), পৃ. ২৮।
২. তদেব, পৃ. ৭৮।
৩. তদেব, পৃ. ২৫২-৫৩।
৪. তদেব, পৃ. ১০৯-১১।

৫. 'কি করিব কর্তব্যবোধে লোকের অপ্রিয় হইতে হইল।' তদেব, পৃ. ১২১।
৬. অথচ আর দু'মাস মাত্র অপেক্ষা করলে স্কুলের বোনাস-স্বরূপ অনেক টাকা পেতে পারতেন।
৭. তদেব, পৃ ১৬১-৬৪।
৮. শিবনাথ-রচিত 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮) পুস্তকে ছাত্রসমাজে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে।
৯. 'An orthodox gentleman of the old schoool who was not at all sympathetic towards Pandit Shastri but reasons to b3 hostile to him, once remarked, "One feels inclined to stand and hear him for hours"—Hemchandra Sarkar, Shivanath Sastri, p. 86.
১০. একজন ছাত্র এ সম্পর্কে লিখেছেন 'তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়েছে দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে এবং চিত্ত ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া ভূমার আশ্রয় লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে শিখিয়াছে।—রজনীকান্ত গুহ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩২৬।
১১. কুমারী কামিনী সেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, কুমুদিনী খাস্তগীর, সরলা মহলানবিশ ও হেমলতা ভট্টাচার্য এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।
১২. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ.১৯৬।
১৩. হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী (১৯২০), পৃ. ২৩৪-৩৫।
১৪. তদেব, পৃ. ২৩৬।
১৫. শিবনাথের স্ত্রী-শিক্ষা-সম্পর্কিত মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা বেথুন ও এদেশে স্ত্রী শিক্ষা, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১, পৃ. ২৪৪-৫৫। এই প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্গ দেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।'
১৬. রজনীকান্ত গুহ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।
১৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ২৫৩।
১৮. সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয় রচনা, ১২ই ফাল্গুন ১২৮০ (২৩. ২. ১৮৭৪), পৃ. ২২৬-২৮।
১৯. 'উপকথা' (১৯০৭) শিবনাথ রচিত শিশুপাঠ্য বিদেশী-গল্পের অনুবাদ সংগ্রহ। সম্প্রতি কালে 'ছোটদের গল্প' (১৯৬০) ও স্বনামাপুরুষ (১৯৬২) নামে শিবনাথের ছুটি গল্প ও জীবনী সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।
২০. ছাত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—রাধারাণী লাহিড়ী, সোদামিনী খাস্তগীর ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন।
২১. এই নোটগুলি 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ, শ্রাবণ ১২৮০, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১, বৈশাখ ১২৮২, কার্তিক অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যা।

শিবনাথ শাস্ত্রী ও নারীসমাজ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিভিন্ন স্মৃতিমূলক রচনায় নিজেকে যে নারী-জাতির পক্ষপাতী বলে ঘোষণা করেছেন, তা কোনো ঝোঁকের মাথায় করা মন্তব্য নয়। তাঁর নিজের জীবনাচরণের মধ্য দিয়েএকথা নিঃশেষে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই নারী কল্যাণ-প্রচেষ্টার উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন দু'ভাবে। এক, ব্রাহ্মসমাজ-সৃষ্ট নারীমুক্তি আন্দোলনে এবং দুই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। ব্রাহ্মসমাজের উদ্গাতা রামমোহন তাঁর সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, নারীশিক্ষা প্রবর্তন, কন্যাপণ বিলোপ এবং বহু-বিবাহ প্রথা নিরোধ সম্পর্কিত আন্দোলনে আধুনিক ভারতবর্ষে নারী-মুক্তি যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় সেই কর্ষিত ভূমির উপর হলচালনা করে আন্দোলনকে শস্যে-ফলে পূর্ণ করিয়া তোলেন। ধর্মগত কারণে শিবনাথ রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরী এবং কর্মগত কারণে বিদ্যাসাগর শিবনাথের প্রণম্য মহাজন।

উপরি-উক্ত দুটি অবশ্যগণ্য উত্তরাধিকার ব্যতীত আপন পারিবারিক পরিবেশের কারণেও শিবনাথ নারীজাতির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। মাতা-মহীর ধর্মপ্রাণতা ও উদারতা শিবনাথকে বাল্যকাল থেকেই আকর্ষণ করত। মাতা গোলকমণি দেবীর আত্মমর্যাদা, রুচিবোধ এবং অপরিসীম স্নেহ শিবনাথের অন্তরে নারীজাতির জন্য শ্রদ্ধার পাত্র পূর্ণ করে তুলেছিল। ছাত্রাবস্থায় মাতুল দ্বারকানাথের গৌরবময় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য এই শ্রদ্ধার পাত্রকে পূর্ণ করে উদ্বেলিত করেছিল। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সুকিয়া স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বালবিধবা কালিমতী দেবীর প্রথম বিধবা-বিবাহে উপস্থিত ছিলেন ন'বছরের বালক শিবনাথ ভট্টাচার্য। সুতরাং শিবনাথ সঙ্গত কারণেই বলেছেন, 'শৈশবাবধি আমি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ।' শিবনাথ ধর্মান্তরিত হলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্যই ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে উভয়ের মনের এমনই সাযুজ্য ছিল যে, এ নিয়ে কেউ অনুযোগ করলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতেন, 'ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।' এটি কোনো উচ্ছ্বাস বা স্নেহের উক্তি মাত্র নয়। বিদ্যাসাগর কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন। বউবাজারের

সুবিখ্যাত সমাজনেতা শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবা-বিবাহকে (শিবনাথের ভাষায় 'জগাখিচুড়ি বিবাহ') কেন্দ্র করে শিবনাথ এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে অভিমান ও ভালবাসার টানাপোড়েন চলেছিল, শিবনাথের 'আত্মচরিত'-এর পাঠকের তা অজানা নয়। লক্ষণীয় যে, এই টানাপোড়েনে শিবনাথের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়েছিল ; বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে কিছুটা আত্মসম্মান অবদমিত করেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস যে বিধবাবিবাহ করেন, তার দায়িত্ব শিবনাথের চেয়ে তাঁকেই বেশী নিতে হয়েছিল। কিন্তু মহালক্ষ্মী-যোগেনের বিবাহের সমস্ত দায়িত্বই শিবনাথকে বইতে হয়েছিল। কোন্ শিবনাথ ? এল. এ. পরীক্ষার্থী শিবনাথ। বিদ্যাসাগরের চেলা শিবনাথ। এই বিবাহের ইতিহাস একই কালে রোমাঞ্চকর ও করুণরসাত্মক। বিপত্নীক বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বিদ্যাভূষণ নামে খ্যাত)-এর সঙ্গে অপর এক বন্ধু ঈশানচন্দ্র রায়ের বিধবা ভগ্নী মহালক্ষ্মীর বিবাহে শিবনাথ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করলেন। ভরসা শুধু স্কলারশিপের টাকা। যে অবস্থায় শিবনাথ নিজেই দয়ার পাত্র, সে অবস্থাতেই তিনি এই গুরুভার বহনে অগ্রসর হলেন। স্বামীর কাছে মহালক্ষ্মী যে কথা বলতে সঙ্কুচিত হন, অকপটে তা ধর্মভ্রাতা শিবনাথের কাছে ব্যক্ত করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মহালক্ষ্মী অকালে চলে গেলেন। ছাত্রী-ভগিনী-বান্ধবী শিবনাথের অন্তরকে ভেঙ্গে দিলেন।

মহালক্ষ্মী শিবনাথের প্রথম ছাত্রী নন। খুব ছোট থেকেই গ্রামের বিভিন্ন ধরনের মেয়েরা পড়াশুনোর জন্য শিবনাথের কাছে আসতেন। এক গৌরাঙ্গী বিধবা যুবতী, সম্পর্কে শিবনাথের খুড়ী, শিবনাথের প্রথম ছাত্রী। তখন শিবনাথ স্কুলে পড়েন। কলেজের ছাত্রী মহালক্ষ্মী। এম. এ. পাশ করার অব্যবহিত পরেই 'শাস্ত্রী' উপাধি পেয়ে শিবনাথ কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-বিদ্যালয়ে নাম-মাত্র পারিশ্রমিকে শিক্ষকতাকার্যে যোগ দেন। প্রতিদিন দুপুরে আশ্রমবাসিনী-দের তিনি পড়াতেন। এ-সময়ে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রীদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের পত্নী জগন্মোহিনী দেবী একজন। গুণমুগ্ধ এই ছাত্রীটি পড়াশুনোর ব্যাপারে স্বামীকে পর্যন্ত আমল দিতেন না। অনেক পরে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিবনাথ জড়িত হয়েছিলেন। শিক্ষকতার কাজ করেই শিবনাথের কর্তব্য শেষ হত না। মহিলাদের কী ধরনের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, সে বিষয়েও শিবনাথ

একটা নিজস্ব ধারণা পোষণ করতেন। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিল। ধর্মশিক্ষাকে যেমন তিনি শিক্ষাজীবনের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করতেন (এই কারণে তাঁর উদ্যোগে তিনি মহিলা প্রতিষ্ঠিত রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন), তেমনি মেয়েদের জ্যামিতি, লজিক, মেটাফিজিক্স প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ভাবতেন।[১] ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় স্থাপনান্তেও তিনি এই মত পরিপোষণ করতেন। মহিলাদের শিক্ষার উপর তাঁর আস্থাও ছিল প্রভূত। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'মহাত্মা বেথুন ও এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে পঠনীয়। এখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন, 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।'

ব্যক্তিগত সম্পর্কেও এই নারীসমাজ শিবনাথের অন্তরঙ্গস্থানে অধিষ্ঠিত। ভগিনী উন্মাদিনী, কন্যাগণ, যেমন তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেছেন, ততোধিক আকৃষ্ট হয়েছেন বৃহৎ বিশ্বসংসারের বিচিত্র নারীগণ। এঁদের কেউ স্বদেশিনী কেউ বা বিদেশিনী। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রার্থনা সত্ত্বেও শিবনাথ আত্মচরিত রচনা করেননি। কিন্তু করেছেন লাবণ্যপ্রভা বসুর অনুরোধে। লাবণ্যপ্রভা সম্পর্কে তিনি ১৭. ১০. ১৯০১ তারিখের ডায়েরীতে লিখেছেন, 'লাবণ্যপ্রভার ঋণ কি কখনও শুধিতে পারিব? আমাকে এরূপ কেহ কখনও ভালবাসে নাই। আমি বোধ হয় এত ভাল কাহাকেও বাসি নাই। ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী আছে।' আবার ইংলণ্ডের ডায়েরীতে দেখি মিস্ ক্যাথারিন ইম্পে তাঁর কাছে সহজেই 'কাথুরাণী' এবং মিস্ সোফিয়া ডবসন্ কলেট 'কলেট দিদি'তে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বের বিস্তৃত আঙিনা বিশ্বমানব শিবনাথের কাছে এক পরমাত্মীয়ে পরিণত হয়েছিল এই নারীদের ভালবাসাতেই। ধর্মান্তরিত শিবনাথকে যখন ক্রুদ্ধ পিতা হরানন্দ হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত তখন গ্রামের মেয়েরাই তাঁকে আশ্রয় দিয়ে বলতেন, 'পণ্ডিতমশাই ভেবেছে কি, সে কি গ্রামের কর্তা?' বড়বেলুনে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে যখন গ্রামের পুরুষ অধিবাসীদের নির্মমতায় অভুক্ত অবস্থায় শিবনাথের প্রাণ-সংশয়, তখন গ্রামের মেয়েরাই গোপনে আহার্য যুগিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন। এ-যেন সেই বুদ্ধকে সুজাতার পরমান্ন প্রদান!

শিবনাথের সাহিত্যকীর্তি রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনলাভে ধন্য। এই সাহিত্য-সংসারেও নারীরা ভীড় জমিয়েছেন অধিক সংখ্যায়। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার, রাণী দুর্গাবতী, চৈতন্যজননী শচীদেবী, উপেক্ষিতা লক্ষ্মণ-জায়া উর্মিলা, মদমত্তের উপেক্ষিত পত্নী, আসঙ্গলিপ্সু বনিতা, বালবিধবারা এসে তাঁর কাব্যের উপকরণ হয়ে উঠেছেন। অশেষ প্রীতি সহানুভূতিতে সমাজের এই বিভিন্ন স্তরের মানবীরা দেবীত্ব অর্জনে সমর্থ হয়েছেন শিবনাথের কাব্যাবলীতে। 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের 'বহুদূর নয়' কবিতাতে শিবনাথ দেশপ্রেমের যজ্ঞে অতি সহজেই তাঁর এই পরমাত্মীয়াদের ডেকে বলতে পেরেছেন,—

'আর কারে ডাকি ওঠো গো ভগিনি
ভারতললনা, কারার বন্দিনী
তোরা না উঠিলে দেশ যে উঠে না
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না।'

—তাঁর প্রথম উপন্যাস মেজবউ 'বঙ্গ-কুল-যুবতীদিগের জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত।' প্রকৃতপক্ষে শিবনাথের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল এই মহিলা পাঠিকাগণ। এই উপন্যাসের উদারচিত্তা কর্মকুশলা জ্ঞানবতী বধূ প্রমদা, 'যুগান্তর'-এর বিজয়া এবং 'নয়নতারা'র নাম-চরিত্র শিবনাথের মানস-কন্যা। নারীচরিত্র অঙ্কনে তিনি দীনবন্ধুর সাফল্যের অধিকারী। আসলে এঁরা সবাই তাঁর চোখে দেখা বাস্তব জগতের অতি-বাস্তব ভালবাসা-শোকে-দুঃখে মণ্ডিতা মানবীরা। মেয়েরা কিছুতেই তাঁর কাছে খারাপ বলে প্রতীয়মান হতে পারেন নি। তাঁর ডায়েরীর একস্থানে তিনি লিখেছেন, '...আমার Female Characters গুলি সবই ভাল করিতে যাইতেছি, এটাও কি স্বাভাবিক? বাঁদর মেয়েও তো সমাজে আছে। কিন্তু কেন জানি না, মেয়েমানুষকে বদ দেখিতে বা অঙ্কিত করিতে আমার ভাল লাগে না। যুগান্তরের মাতঙ্গিনী হতভাগিনীকে বদ করিতে গিয়াও সম্পূর্ণ বদ করিতে পারি নাই। তত wicked নহে যত silly—আমার বোধহয় সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে wickedness তাহাদের মধ্যে বড় কম, তাহারা যে পাপে যায় তাহা silliness এর জন্য।' এর পর মন্তব্য বাহুল্য মনে করি।

এই সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মেয়েদের জন্য 'গৃহধর্ম' গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে ভাই-ভগিনী, সন্তান-মাতা, পতি-পত্নী

মিলে যে নিবিড় সংসার তার বন্ধনের সূত্র যে প্রীতি, তা-ই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। নারী-জাতির এমন সুহৃদ্ জগতে সর্বকালে প্রার্থনীয়।

শিক্ষকতা, গ্রন্থরচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির মঙ্গলপ্রার্থনা বিষয়ে শিবনাথ একক দৃষ্টান্ত নন। কিন্তু যে ব্যাপারে শাস্ত্রী মহাশয় প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেন, তা হল পতিতা নারীর কন্যাগণকে পাপের পথ থেকে উদ্ধার করে এনে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। লক্ষ্য যেখানে স্থির, উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ সেখানে বাধাবিপত্তি তুচ্ছ হয়ে যায়। এই কাজ করতে গিয়ে শিবনাথের কয়েকবার প্রাণ পর্যন্ত সংশয় হয়েছিল। কিন্তু ভয় শব্দ পণ্ডিত শাস্ত্রীর অভিধানে ছিল না। এই কাজ ব্যাপকভাবে ঘটতে পারে না। নানা সামাজিক বাধা এসে এই পথকে বারবার কণ্টকিত করে। তবুও এইসব নারী শাস্ত্রীমহাশয়ের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়ে ভবিষ্যৎকালে সুগৃহিণী হয়েছেন এবং রত্নাগর্ভা হয়ে সমাজের উচ্চকোটিতে স্থান পেয়েছেন। পতিতা-কন্যা লক্ষ্মীমণি, থাকমণি, কুসুমকুমারীরা শিবনাথ-প্রসন্নময়ীর শান্তির নীড়ে বর্ধিত হয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মত প্রশ্বাস-বায়ুর প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। আমি এখানে লক্ষ্মীমণির লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করছি। এ থেকে পতিতা নারীরা শিবনাথ সম্পর্কে কি ভাবতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে :…'অল্প কয়েকদিন হইল আমি শিবনাথ-বাবুর পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে আসিয়াছি। শিবনাথবাবু এখানকার স্কুলের মাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। ইঁহাদের ভালবাসায় আমি সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। শিবনাথবাবুর সভতায় আমি অনেক সময় ভাবি তিনি মানুষ না দেবতা। রাগ নাই, সুখ-দুঃখ জ্ঞান নাই, আপন-পর ভেদ নাই; আমাকে ঠিক নিজের কন্যার মত ভালবাসেন। ছেলের লেখা পড়ার জন্য তাঁর যেমন যত্ন, আমার জন্যও তদ্রূপ করেন। কলিকাতায় থাকিতে একদিন কোন এক ব্রাহ্ম-বাড়ী হইতে সপরিবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়া যাইতে তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া যান; এজন্য শিবনাথবাবু কাহাকেও সে বাড়ী যাইতে দেন নাই, এবং নিজেও সে কার্যে যোগ দেন নাই। এরূপ সাধু লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে আমি আর কোন সুখ চাই না।'—পত্রটি শিবনাথের নারীপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

নারীসমাজ অকৃতজ্ঞ নয়। শিবনাথের জীবৎকালে তাঁরা যে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার আস্বাদন লাভ করেছেন, শিবনাথের মহাপ্রয়াণে তাকেই উপচার করে

তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০এ সেপ্টেম্বর কলকাতা শহরের পথে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। শিবনাথের পবিত্র দেহ পুষ্পমালো সুশোভিত, আচ্ছাদিত। শ্মশানের মহাযাত্রায় শত-সহস্র ব্যক্তি পংক্তিভুক্ত। এঁদের সঙ্গে মনস্বিনী কয়েকজন নারীও পদব্রজে শবানুগমন করছেন। কবি কামিনী রায় তাঁদের পুরোভাগে। নারী জাতির পক্ষপাতী শিবনাথ তাঁদের পক্ষপুটের বিস্তীর্ণ ছায়ায় যেন মহাশান্তি লাভ করলেন।

আচার্য শাস্ত্রীর মৃত্যুর দু'বছর আগে কলকাতার এক বিশেষ উৎসবে (১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ইস্টারের ছুটিতে) ব্রাহ্ম মহিলাগণের পক্ষ থেকে অভিবাদন পাঠ করেছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন—'ব্রাহ্মসমাজের নারীচিত্তে আপনি যে সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছেন তাহাতে আজ আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সম্মানিত করুন।' আর কবি কামিনী রায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও চলতে পারি—'আপনি নারীজাতিকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, আপনি তাহাদের কিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা সকলেই তাহা জানি।...আপনার পবিত্র চরিত্র, আপনার কঠোর ত্যাগ স্বীকার, আপনার প্রকৃতির মধুরতা ও আপনার ধর্মপ্রাণতা আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছি...আমাদের শিশুসন্তানেরাও আপনাকে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করুক এবং আপনার চরিত্রের প্রভাব তাহাদের উপরও থাকুক। আপনাকে প্রণাম করি।'

আবার বলি, আপনাকে প্রণাম করি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. ভারত-আশ্রমের ছাত্রীদের, যেমনঃ রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগীর, রাজলক্ষ্মী সেন প্রভৃতি, মুখে মুখে যে নোট দিতেন, ছাত্রীরা সেগুলি টুকে রাখত। এর কতকগুলি বামা-বোধিনী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মৃত্যুর আলোকে শিবনাথ শাস্ত্রী

আজ এই বিশেষ দিনটিতে এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি প্রভূত আনন্দলাভ করেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষ কিছু বলবার অনুমতি দিয়ে আমাকে বহুমানে ধন্য করেছেন, চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রাচীনকালের স্মরণ্য ব্যক্তিরা আমাদের নিত্য আরাধনার পাত্র। আপন জীবনের মহান আদর্শ আমাদের চোখের সামনে প্রতিষ্ঠিত রেখে অনুক্ষণ তাঁরা আমাদের আকর্ষণ করে চলেছেন। উনিশ শতক এমন কতকগুলি ধীমান মনীষীর আবির্ভাবকে সম্ভব করেছিল যাঁরা স্বদেশবাসীর অন্তরে পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত, নিত্যস্মরণ্য!

যাঁরা আমাদের ভালবাসার জন, যাঁরা প্রিয়জন, অন্তরের অন্তরাত্মায় যাঁদের নিত্য অধিষ্ঠান, তাঁদের তো আমরা আমাদের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের মধ্যে কতভাবেই না স্মরণ করে থাকি। তবুও একটা বিশেষ দিনকে উপলক্ষ করে আমরা সমবেত হই, তাঁদের কথা স্মরণ করি এবং অন্তরে অশেষ প্রকার কল্যাণ ও প্রেমের স্পর্শ অনুভব করি। এই একটা বিশেষ দিনে তাঁদের স্মরণ করার প্রয়োজন আছে বইকী! দশকের প্রস্তরখণ্ডে থমকে দাঁড়িয়ে, স্মরণ্য ব্যক্তিকে যেন আরও নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়। কালের কষ্টিপাথরে তাঁদের শুচিতা, পবিত্রতা যেন আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। আজ আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি দিবস! সেই উপলক্ষেই আমরা সমাগত। সুতরাং সেদিক থেকে দিনটি আমাদের কাছে বিশেষ মূল্য বহন করে এনেছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন বিচিত্র কর্মান্দোলনে আন্দোলিত। বহিরঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা; অন্তরঙ্গে তিনি উচ্চভাবের সাধক। বহিরঙ্গে তিনি ধর্মসংস্কারক, অন্তরঙ্গে তিনি খ্যাতিমান সাহিত্যিক! আসলে সাধক মাত্রেই কবি কারণ ঋষিরা মন্ত্রধারা দেখে থাকেন। এ হল শিবনাথের সর্বকালের পরিচয়। কিন্তু আজকের দিনে যে উপলক্ষে আমাদের একত্র হওয়ার সুযোগ হয়েছে, যে পুণ্যস্মৃতি আমাদের অন্তরে স্বতোদীপ্যমান, শিবনাথের মহাপ্রয়াণের যে বেদনা বাঙালীচিত্তে আজও জাগরূক, সেই মহান্ মৃত্যু সম্পর্কে আচার্য শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত

উপলব্ধি কি ছিল, তার কিছু কিছু কথা আমরা আলোচনা করছি।

আচার্য শাস্ত্রীর জীবনের শেষচিত্র তাঁর কন্যা হেমলতা দেবী এই ভাবে অঙ্কন করেছেন, '৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আজ শিবনাথের জীবনে শেষ সূর্যোদয় হইয়াছে। শহরে বার্তা ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে বন্ধুগণ, ভক্তগণ, শেষ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গৃহে সমবেত হইলেন। ...প্রিয়জনদের ডাক কর্ণে গেল, মুখে হাসি ছড়াইয়া পড়িল, শয্যাপার্শ্বে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল।...শিবনাথ প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে 'ওঁ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন! কণ্ঠে এখন ধ্বনি নাই, কেবল ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে। পত্নী মুখের কাছে কান পাতিয়া শুনিলেন, অতি মৃদু 'ওঁ ব্রহ্ম' ধ্বনি! দুইবার নিঃশ্বাস ফেলিলেন—শান্তিবচন শুনিতে শুনিতে শিবনাথের পবিত্র আত্মা জীর্ণদেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল। সে গৃহে হাহাকার নাই—বিলাপ নাই, চক্ষের জলে সকলের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শয্যার দিকে সকলে চাহিয়া দেখেন যেন কোন যোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন! মুখশ্রী শান্ত, সুন্দর পবিত্র ও নির্মল।'

'মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবরের' শেষদৃশ্য স্মরণ করতে গিয়ে আজ পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের চোখের পাতা ভিজে যায়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। শিবনাথের মৃত্যু-উপলক্ষে একটি শোকরচনা 'বাঙালী' পত্রিকার সুবিখ্যাত সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন 'চলিয়া গেল' বলে। মৃত্যু ব্যাপারে শিবনাথের কোন ক্ষোভ ছিল না, ছিল না কোন আশঙ্কা। সেকারণেই মৃত্যু-মুহূর্তে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল নির্মল হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগসূত্রে শিবনাথ বহু মহান মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন। দীর্ঘ বাহাত্তর বছরের জীবনে তিনি বহু মৃত্যুর শোককে আপন অন্তরে বহন করে এসেছিলেন। বন্ধুবর দুর্গামোহন দাসের সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবীর মৃত্যুতে তিনি কতখানি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, সে সময়ের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কতকগুলি কবিতায় তার বহুতর প্রমাণ সুলভ্য। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ শিবনাথকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হয়। কেশবচন্দ্রের অন্তিম অবস্থায় শিবনাথ গিয়ে দেখেন, রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'সে যন্ত্রণা, সে আর্তনাদ, সে কাতরানি দেখিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না।'

'৮ই জানুয়ারী প্রাতে তাঁহার আত্মা নশ্বরধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল।...সে-প্রাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাদুকাহীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্মশানঘাটে গেলাম এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্যতম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।' ঘটনাটি উল্লেখের যথেষ্ট কারণ আছে। সম্ভবত এই ঘটনাটি শিবনাথকে মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে প্রথম চিন্তিত করে তুলেছিল। বলাবাহুল্য মরণকে তিনি 'শ্যাম সমান' দেখেন নি কিন্তু জীবনে মৃত্যুরও যে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে, একটি উল্লেখ্য ভূমিকা আছে, মৃত্যু যে জীবনের একটি অবশ্যম্ভাবী ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এ চিন্তা এই সময় থেকেই শিবনাথের অন্তরে দানা বাঁধতে সুরু করে। মনে রাখতে হবে, শিবনাথের বয়স তখন মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। কিন্তু এই বয়সেই মৃত্যুর চিন্তা তাঁকে আলোড়িত করেছিল। আসলে দর্শনের গভীরে তিনি ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনের রহস্য তাঁর কাছে প্রাঞ্জল হয়ে পড়েছিল। জীবনে মৃত্যুর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শিবনাথ লিখেছেন, 'মৃত্যু আমাদের শত্রু নহে, মৃত্যু বন্ধু, কারণ মৃত্যু ত্রিবিধ উপকার সাধন করে। প্রথমতঃ মৃত্যু আমাদের প্রণয়কে বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের হৃদয়কে উন্নত করে, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু আমাদিগকে সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া দেয়, তৃতীয়তঃ ঈশ্বরকে ও পরকালকে নিকটে আনিয়া দেয়।' খণ্ডিত জীবন এইভাবে মৃত্যুর সন্নিধানে অখণ্ড ও পূর্ণ হয়ে ওঠে, শিবনাথের এই বিশ্বাস লেখাটির মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ফুটে উঠেছে।

মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তা দ্বিতীয়বার আলোড়িত হয়ে ওঠে ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর সতেরো বছর পরে, আর একটি প্রিয়জনের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে। ১৯০১ সালের ৩রা জুন তারিখে শিবনাথের প্রথমা পত্নী, ব্রাহ্মসমাজের বড়মা প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু শিবনাথের হৃদয়ে অসহনীয় আঘাত হেনেছিল। মূক বেদনা শিবনাথকে নিদারুণ অসুস্থ করে তুলল। শিবনাথ তখন পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে গেছেন। মৃত্যু এসে অসুস্থ শিবনাথকে মাঝে মাঝে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময়ে শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রায় দুইমাস হইল জানিতে পারা গিয়াছে যে আমার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছে।' স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটায় মৃত্যুর যে পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, সেকথার উল্লেখ করে শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'বলিতে গেলে আমার জীবনের এক নূতন

অধ্যায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে। সেজন্ত এই দৈনিকলিপি আরম্ভ করিতেছি। ...সত্য সত্যই মৃত্যু আমার কেশে ধরিয়াছে। এখন প্রতিদিন মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া আমার ক্লেশ হইতেছে না। বরং এক প্রকার সন্তোষ ও শান্তি অনুভব করিতেছি' (১৫. ১০. ১৯০১)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের-ডায়েরী লেখার পর তিনি ডায়েরী লেখা বন্ধ করেছিলেন। বহুদিন পরে ১৫ অক্টোবর ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি আবার ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্টমাসে শিবনাথ-জননী গোলকমণি দেবী পরলোক-গমন করেন। এই ঘটনা শিবনাথকে মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।

এই প্রকারের কয়েকটি মৃত্যু শিবনাথকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলেছিল বলেই আপন জীবনে মৃত্যুকে তিনি এত সহজে অঙ্গীকার করে নিতে পেরেছিলেন।

'নারায়ণ' পত্রিকায় সুসাহিত্যিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী শিবনাথ প্রয়াণে যে কথা লিখেছিলেন, আজ পঞ্চাশ বছর পর সেকথা উদ্ধার করে আচার্যের প্রতি আমার অন্তরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 'পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মরেন নাই প্রাণ দিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে সম্মান করিব। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিকে সম্মান করিতে দাঁড়াইয়া আমরা একটা গর্ব অনুভব করিব।' ওঁ শান্তি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত।

শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত ডায়েরী-প্রসঙ্গে

আভাষণ

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো সত্যনিষ্ঠ, আত্মপ্রচারবিমুখ একজন ব্যক্তির কিছু অপ্রকাশিত ডায়েরী আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে। এর পূর্বে শিবনাথের 'আত্মচরিতে' এবং তাঁর কন্যা হেমলতা দেবী লিখিত 'শিবনাথ-জীবনী'-তে তাঁর অন্যান্য ডায়েরীর কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। ইংলণ্ড-বসবাসকালে শিবনাথ যে ডায়েরী রেখেছিলেন (জাহাজে ওঠার দিন থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন পর্যন্ত) শিবনাথের পুত্রবধূ অবন্তী দেবীর সুযোগ্য সম্পাদনায় সেটি বহুপূর্বেই 'দেশ' পত্রিকায় 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' নামে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ; পরে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। (কিছু অংশ সম্প্রতি 'আলেখ্য'-তেও প্রকাশিত।) এর একটি অংশ 'ইংলণ্ডপ্রবাসীর আত্মচিন্তা' নামে যুগান্তরের রবিবাসরীয় সাময়িকীতে এক সময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ছাড়াও আরও কিছু দিনলিপির অংশ আমাদের সংগ্রহে আছে, যেগুলি অদ্যাবধি অপ্রকাশিত। হেমলতা দেবী জানিয়েছিলেন যে, শিবনাথ ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫-এ জুলাই তাঁর ডায়েরী লেখা শেষ হয়েছিল বলে আমার অনুমান। এর মধ্যে 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' নামক অংশ প্রকাশিত। ডায়েরীর অন্যান্য অংশ যা ইতিপূর্বে অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমি ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ থেকে ২৫-এ এপ্রিল ১৯১৪ পর্যন্ত (পূর্বোক্ত অংশ বাদে) বিচ্ছিন্নভাবে রাখা মোটামুটি ৫৮২ দিনের দিনলিপির উল্লেখযোগ্য অংশগুলিকে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। একটি কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—শিবনাথ কখনও একটানা নিরবচ্ছিন্ন ডায়েরী লিখে যাননি—মাঝে মাঝে ছেদ ঘটিয়েছিলেন। ডায়েরীতে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন—১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ডায়েরী লিখে তিনি দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর ডায়েরী লেখেন নি—ইংলণ্ডের ডায়েরীটুকু এই হিসেব থেকে বাদ যাবে। ১৫ই অক্টোবর ১৯০১ তারিখে পুনরায় ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করে নিজেই লিখেছেন—'বহুদিনের পর আবার

দৈনিক লিপি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছি।'

ডায়েরীর কোনো কোনো অংশ নিয়ে ইতিপূর্বে বর্তমান লেখক যে দু'একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সেগুলিকেও এই আলোচনার পরিধিভুক্ত করিনি।

এই ডায়েরীগুলি ছাড়া আরও দু'টি অপ্রকাশিত দিনলিপিভিত্তিক রচনা আমাদের হাতে এসেছে। এর প্রথমটির অতি অল্প অংশ হেমলতা দেবী ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী যথাক্রমে 'শিবনাথ-জীবনী' ও 'আত্মচরিতে' উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয় খাতাটিকে দিনলিপি না বলে একে শিবনাথের ধর্মজীবনের কড়চা নাম দেওয়া যেতে পারে। এটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।[১] যদিও এই কড়চাটি ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হয়ে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে, তবুও এটি বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত এবং দিনের সংখ্যা অঙ্গুলিপর্বগণ্য। প্রথমটির বাকী অংশ এবং দ্বিতীয়টির সমগ্র প্রকাশ করা যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য সম্পাদনা-কর্মটি দু'টি প্রায়-নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'ক'-অংশে 'ব্যক্তি-প্রসঙ্গ' এবং 'খ' অংশে 'আত্ম-প্রসঙ্গ' ও 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ' আলোচিত হয়েছে।

শিবনাথের ডায়েরীকে আমি তাঁর দ্বিতীয় আত্মচরিত মনে করি। এখানে নির্বাচিত অংশগুলি মাত্র প্রকাশিত হল। সুযোগমত তাঁর সমগ্র ডায়েরীটি প্রকাশ করা যাবে। ডায়েরীগুলি আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রয়াত সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্রের সৌজন্যে পেয়েছিলাম। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই। 'আলেখ্য' কর্তৃপক্ষ এই সম্পাদনাকর্মটি প্রকাশ করে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন—পত্রিকার উজ্জ্বল ও দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করি।

ক-অংশ ঃ ব্যক্তিপ্রসঙ্গ

রামমোহন রায়

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রামমোহন রায় রংপুর থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকেই কলকাতা শহর নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আন্দোলিত হয়। বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে রামমোহনের বিচিত্রমুখী কর্মোদ্যোগ নানাভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, সমাজ-সংস্কারের যাজ্ঞিক পুরোহিত রামমোহনের প্রতি

শিবনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রামমোহনের সমগ্র জীবনকে তিনি একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ রামমোহন এই পৃথিবীতে সাধারণের মধ্যে জন্মে ও লালিত হয়েই সাধারণের উপর মাথা তুলে উঠেছিলেন। এই কারণে শিবনাথ রামমোহনকে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে যখনই সুযোগ পেয়েছেন স্মরণ করেছেন। শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে জানতে পেরেছি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে'র তিনি একজন একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন—'আজি ৪ ঘণ্টাতে নগেন্দ্রবাবুর লিখিত রামমোহন রায়ের জীবন চরিতখানি সমুদয় পড়িয়া ফেলা গেল' (২৭. ৪. ১৮৮৪)। এর পরে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিবনাথ-রচিত 'রামমোহন রায়' নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। 'মুকুল' পত্রিকাতেও রামমোহনের একটি শিশুপাঠ্য জীবনচরিত প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ সংখ্যায়। Hindusthan Review পত্রিকাতে শিবনাথ রামমোহন সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন ইংরেজিতে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য কোনো ইংরেজি প্রবন্ধ রচনার পূর্বে শিবনাথ কোনো ভালো ইংরেজি বই পড়ে মনকে প্রস্তুত ক'রে নিতেন—বিশেষ করে Thackeray-এর কোনো বই।—'যখনই আমার কিছু ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে হয় তৎপূর্বে বা সেই সময়ে Thackerayর কোনো গ্রন্থ পড়ি' (১. ৯. ১৯০৩)। এই একই সময়ে Indian Messenger পত্রিকায় তাঁর 'The Central Idea of Rammohan Roy's Mission' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির রচনা ও প্রকাশের তারিখ যে যথাক্রমে ১৯. ৯. ১৯০৩ এবং ২৭. ৯. ১৯০৩ একথা আমরা অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে জানতে পেরেছি।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ড যান। ইংলণ্ড পরিদর্শন কালে তিনি রামমোহনের সমাধিস্থল ব্রিস্টল নগরেও যান। একথা অনেকেই জানেন না যে রামমোহনের আবক্ষমূর্তি ও ব্যবহৃত পাগড়িটি (cast and turban) শিবনাথই ব্রিস্টল থেকে স্বদেশে নিয়ে আসেন। রামমোহনের মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন করে তাঁর স্মৃতিতর্পণ শিবনাথের বাৎসরিক কর্তব্য ছিল। এমনি এক সাতাশে সেপ্টেম্বরে (১৯০৩) সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত রামমোহনের সাম্বৎসরিক মৃত্যু দিবসে শিবনাথ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সঙ্গে বক্তৃতা করেছিলেন।

নিজের জীবনে শিবনাথ বহু মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদের

গুণাবলীর এক একটি পুষ্পচয়ন করে নিজের আদর্শ জীবনের অমলিন মালিকা গেঁথেছিলেন। এই সব ব্যক্তিদের জীবনের মূলসূত্রগুলি তিনি যে-দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই মত একটি দীর্ঘ সংস্কৃত কবিতায় নিবদ্ধ করেছিলেন। এই দীর্ঘ শ্লোকনিচয়ে স্বদেশী-বিদেশী বহু ব্যক্তি উপযুক্ত মর্যাদায় স্থান পেয়েছেন। এক সময়ে রামমোহনকেও শিবনাথ এই তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ৮. ১০. ১৯০৭ তারিখের ডায়েরীতে শিবনাথ লিখেছিলেন—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ রামমোহন আত্মবান্।' শ্লোকটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন—'আত্মবান্ শব্দটি এই জন্য দিয়াছি যে Self-respect ও dignity রাজার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। আত্মবান্—অর্থাৎ self-respect, self-control, self-help, serenity ও dignity বিশিষ্ট'। এই মূল্যায়ন যথার্থ মনে করি।

কিন্তু ২. ৮. ১৯০৯ তারিখের ডায়েরী পাঠে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি গুরুকীর্তনে দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশে তিনি এই তারিখে গুরুকীর্তন থেকে রামমোহনের নাম অপসারিত করেন। যদিও পরে ১. ৩. ১৯১৪ তারিখে গুরুবন্দনার দীর্ঘতম রূপপ্রদানকালে রামমোহনের নাম পুনর্বার উল্লিখিত হতে দেখি। মাঝখানে এই অপসারণের কারণ কী সঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু অন্তত একটি বিশেষ কারণে শিবনাথ রামমোহনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—ডায়েরীপাঠে একথা জানতে পারি। এই প্রসঙ্গটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রসঙ্গটি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মনে নানা বিতর্ক সৃষ্টি করে এসেছে। রামমোহনের একজন যবনী উপপত্নী ছিল—একদল জীবনীকার একথা বলে গেছেন। অপরপক্ষে শ্রদ্ধাবান্ পাঠকেরা একে জুগুপ্সাব্যঞ্জক উক্তি বলে পরিহার করেছেন। অথচ ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে শিবনাথ যখন রাজনারায়ণ বসুর নিকট দেওঘরে ছিলেন, তখন ৫ই এপ্রিল তারিখে রাজনারায়ণের সঙ্গে তাঁর নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হতে হতে 'রামমোহন রায় সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে (অর্থাৎ রাজনারায়ণকে) বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায়ের একটি যবনী উপপত্নী ছিল। Adams সাহেব একথা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন রায় পথ্যপ্রদান নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের কতকগুলি আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন তন্মধ্যে "শৈব বিবাহের" পক্ষ সমর্থন করিয়া তন্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহার

বিপক্ষগণ তাঁহার প্রতি উক্ত দোষারোপ করিত এবং তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'রামমোহন রায়ের এই শৈব বিবাহের পোষকতার কথা যেদিন অবধি শুনিয়াছি সেইদিন হইতে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা দশ ডিগ্রী কমিয়া গিয়াছে।' মন্তব্যটি বিস্ফোরক। কিন্তু কোনো বিতর্ক তোলার আগে দুটি কথা মনে রাখতে হবে। রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন এবং শিবনাথের সত্যবাদিতা ও পরনিন্দায় অনীহা প্রবাদস্থলীয় ছিল। উক্ত দিনলিপিতে শিবনাথ রামমোহনকে যে শৈববিবাহের পক্ষে বলেছেন, তাও ভিত্তিহীন নয়। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) নামক পুস্তকের ১৬৩ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করেছিলেন, '......নগরান্তবাসীর অদ্যাপি যবনী গমনের চিহ্ন প্রকাশ হইতেছে, যেহেতু, নিজ বাসস্থানের প্রান্তেই যবনীগমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন।' এই গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে ২২৪ পৃষ্ঠায় তর্কপঞ্চানন শৈববিবাহের যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে লিখেছেন,—'...এই শৈব বিবাহে বয়স ও জাতির বিচার নাই, কেবল সপিণ্ডা ও সধবা না হইলেই হইতে পারে, কিন্তু এ স্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে, যাঁহারা যবনীগমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্বদা রত, তাঁহাদিগের স্ত্রীও বিধবাতুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈববিবাহ করা যায় কিনা?'

প্রথম প্রশ্নের উত্তর রামমোহন তাঁর 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩) পুস্তকে এইভাবে দিয়েছেন,—'শৈবধর্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ? সেও বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশাস্ত্রমানে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও তৎসঙ্গে পাপাভাব দেখান তবে তান্ত্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বস্ত্রীত্ব কেন না হয়, শাস্ত্রবোধে স্মৃতি ও তন্ত্র উভয়ই তুল্যরূপে মান্য হইয়াছেন একের মান্যতা অন্যের অমান্যতা হইবাতে কোনো যুক্তি ও প্রমাণ নাই।' পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর এইরূপ : '—স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রীবঞ্চক পুরুষ সর্বথা পাপী হয়েন; কিন্তু ভর্তা বর্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতি শাস্ত্রে লিখেন না; তবে ভর্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোঁসাইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পুনর্বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর

বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা পুনর্ব্বার প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্তের বিবাহ পরে হইতে পারে। অতএব ধর্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনর্ব্বার বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্তকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।'

পাঠক লক্ষ্য করবেন, রামমোহনের যুক্তি একইকালে শালীনতা ও তির্যক-গতিসম্পন্ন। কিন্তু 'নগরান্তবাসী'কে যে যবনীপত্নীগ্রাহক বলা হয়েছে, উভয়স্থানেই রামমোহন সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন। এই 'নগরান্তবাসী' যে রামমোহন স্বয়ং, একথা রামমোহন তাঁর 'পথ্যপ্রদান' পুস্তকের ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন—"আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্মসংহারক "নগরান্তবাসী" এই পদ প্রয়োগ পুনঃ ২ করিয়াছেন।" নগরান্তবাসী শব্দের অর্থ দ্বিবিধ প্রকার—এক, নগরান্তে অর্থাৎ কলকাতার মানিকতলায় বাসকারী রামমোহন, অথবা চণ্ডাল রামমোহন। এবং ধর্মসংহারক বলতে 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থরচয়িতা কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকে বোঝানো হয়েছে।

'পথ্যপ্রদান' ব্যতীত অন্যত্রও রামমোহন শৈববিবাহের সমর্থন করেছেন। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল (২৫ চৈত্র, ১২২৮) সংখ্যার 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' ছদ্মনামে রামমোহনকে চারটি প্রশ্ন করেন। এরই উত্তরদানকল্পে রামমোহন 'চারিপ্রশ্নের' উত্তর নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মুদ্রিত ক'রে প্রচার করেন। তর্কপঞ্চানন 'যবনাদিগমনে প্রবৃত্ত' হওয়াকে নিন্দা করে কুল্লূকভট্ট থেকে পাঁতি উদ্ধার করেছেন। কিন্তু রামমোহন এই 'প্রবৃত্তি'কে শৈবমত দ্বারা সমর্থন করেছেন মহানির্বাণ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে—"যথা বয়োজাতিবিচারোহত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ"। মহানির্বাণ তন্ত্র। শৈববিবাহে বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক। কিন্তু যাঁহারা স্মার্তমতাবলম্বী ও যাঁহাদের উপাসনামতে শৈবশক্তি গ্রহণ হইতে পারে না অথচ যবনী কিম্বা অন্য অন্ত্যজ গমন করেন তাঁহারাই পূর্বোক্ত স্মৃতিবচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সেই২ জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন।"—এই বক্তব্যের পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও রামমোহনের যবনী উপপত্নী ছিল একথা স্বীকারে মনের সায় পাই না। আর এ-বিষয়ে যে খুব

গুরুত্বপূর্ণ—তা-ও মনে করি না।

শিবনাথ যে সময়ে ডায়েরীতে এই সব মন্তব্য করেছেন, সেই কালের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং সেইমত ব্রাহ্মসমাজে বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং রামমোহনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেও শৈব মতকে নিন্দা করার একটা সঙ্গত কারণ রয়েছে। আরও একটি বিষয় মনে হয়, শিবনাথ নিজে ব্রাহ্ম হলেও, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের মত নিজেদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজভুক্ত বলে ঘোষণা না করলেও, ধর্মান্তরকে তিনি খুব একটা সুনজরে দেখতেন না বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ ডায়েরীতে দেখছি (১০. ৭. ১৯০৪) ব্রাহ্ম নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে তিনি দুঃখ পান। আশ্রিতকন্যা থাকমণি খ্রীস্টধর্মগ্রহণ করলে শিবনাথ ডায়েরীতে লিখেছেন, "থাকিটাকে আনিলাম সেই আমার অনুপস্থিতিকালে পলাইয়া গিয়া খ্রীষ্টীয়ান হইল।" প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করছি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'এ জীবনে এই বঙ্গদেশে যত মহাজনদের সংস্রবে আসিয়াছি এবং যাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হইয়াছি, তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি।' (ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯)—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিবনাথ হৃদয়ের এমনই উচ্চাসনে স্থাপিত করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবন শিবনাথকে নানাভাবে অনুকরণে প্রলুব্ধ করত। সুযোগ পেলেই শিবনাথ দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করতে যেতেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞান, টেনিসনের কবিতা, আমিয়েলের জার্নাল এবং সাম্প্রতিক পড়াশুনোর বিষয়ে অবহিত হয়ে শিবনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন। ডায়েরীতে লক্ষ্য করেছি, শিবনাথ দেবেন্দ্রনাথের কাছে অন্যান্য বছবারের মত ২২. ১০. ১৯০১ ; ২৮. ১২. ১৯০৩ ; ৭. ১. ১৯০৪ (মহর্ষির চরণ দর্শন করিতে গেলাম'।) তারিখগুলিতে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মহর্ষির মহাপ্রয়াণ ঘটে। এর পূর্বে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময়ে শিবনাথ সমগ্র ভারত ভ্রমণের জন্য বের হয়েছিলেন। এই প্রচার যাত্রায় সাহারণপুরে অবস্থানকালে তিনি মহর্ষির অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ত্বরিৎগতিতে কলকাতায় ফিরে আসেন। শিবনাথ লিখেছেন, (২৪. ১১. ১৯০৪)—'একেবারে

কলিকাতা চলিয়া আসি।' অবশেষে মহাপ্রস্থান ঘটল।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিবনাথের যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। শৈশবকালে শিবনাথ প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং সবশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হন। ভিন্ন সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিবনাথের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহ ছিল অপরিমের। তাই ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণকল্পে শিবনাথ যখন দেবেন্দ্রনাথের কাছে চাঁদার জন্য যান, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবেন্দ্রনাথ সাত হাজার টাকার 'Unconditional gift' প্রদান করেন।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের তিন তারিখে শিবনাথ প্রচার যাত্রায় বের হয়ে শিবচন্দ্র দেবের কোন্নগরের বাড়ীতে আসেন। এখানে উপাসনাকালে শোনা গেল, দেবেন্দ্রনাথ বজরা করে কোন্নগরের ঘাটে এসেছেন। এদিনের ডায়েরীতে শিবনাথ এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'শুনিবামাত্র কয়েকজন যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে গমন করা গেল। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। আমি তাঁহাকে একটি ব্রাহ্ম Conference-এর কথা বলাতে তিনি বলিলেন, 'Conference-এর আর প্রয়োজন কি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এই সমাজই ভবিষ্যতে এদেশে ব্রহ্মধর্মকে প্রচার করিবেন।' তিনি আরও বলিলেন যে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ স্বরূপ মনে করেন। তিনি বলিলেন আদি সমাজে প্রচারের ভার নাই, রাজা রামমোহন রায় যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাকে অব্যাহত রাখাই তাঁহার লক্ষ্য, প্রচারের ভার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর।' দেবেন্দ্রনাথের মতের ঔদার্য প্রশংসনীয়। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকেও এই অংশ গুরুত্ববহ। এদিন রাত্রে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপাসনা করেন এবং 'অদ্য তাঁহাকে বিশেষ প্রফুল্ল দেখা গেল।'

দেবেন্দ্রনাথের জীবনরেখা শিবনাথ সর্বদা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর সাধননিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন, প্রাচ্যমুখী চিন্তাধারা, উচ্ছ্বাসহীন ভক্তি, পারমার্থিক নীতি ও সৌন্দর্যসাধনা শিবনাথকে নানাভাবে আকর্ষণ করত। এই জীবন-নীতি প্রসঙ্গে শিবনাথ একস্থানে বলেছেন, 'মহর্ষিতে যাহা দেখিয়াছি, তাহা এজীবনে আর কোথাও দেখি নাই, এবং আর যে দেখিব তাহা মনে হয় না।' সেকারণে মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠ শিবনাথের নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শুধু পাঠ

নয়, তাকে অন্তরে গ্রহণের তিনি চেষ্টা করতেন। ৪ঠা জুলাই ১৯০৪ তারিখের ডায়েরীতে তিনি লিখেছেন, 'মহর্ষির আত্মচরিত পাঠ ও তদ্বিষয়ে চিন্তায়' তিনি মগ্ন হয়েছিলেন। ২২. ৫. ১৯০৮ তারিখেও তিনি উক্ত গ্রন্থপাঠ করে দেবেন্দ্র-নাথের অনুসরণে 'জীবনকে পূর্ণ' করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মহর্ষির মৃত্যুর পর যে এই অনুকরণেচ্ছা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ রয়েছে ৮ই এপ্রিল ১৯০৯ তারিখের ডায়েরীতে। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা তাঁকে মুগ্ধ করত। নিজেকে তিনি এবিষয়ে হীন ভাবতেন—'আমার 'সদ্‌গুরু' মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ প্রকৃতিপ্রেমে পূর্ণ ছিলেন, আমি এ বিষয়ে হীন।'

শিবনাথের এই গভীর শ্রদ্ধার সমর্থন আমরা পাই দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর একটি চিঠিতে—'সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্দ্রিক হইয়াছেন।' পত্রটি প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৈশাখ ১৮০৯ শকের সংখ্যায়। পত্ররচনার তারিখ ১৩ই চৈত্র ৫৭ ব্রাহ্মাব্দ (১৮৮৫ খ্রী)। শিবনাথ-দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল।

কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র সেনকে অধিকাংশ লোকে শিবনাথের বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তি বলে ভাবেন। শিবনাথ একসময়ে কেশবচন্দ্রের ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনুগত ছিলেন। তারপর নীতিগত কারণে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য হয় এবং শিবনাথের নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ সমালোচনার অবধি ছিল না। নীতিগত কারণে এই ব্যবধান ঘটলেও শিবনাথের অন্তরে কেশবচন্দ্রের জন্য একটি ভক্তিভিত্তিক অংশ নির্দিষ্ট ছিল। 'জীবনের অন্যতম গুরু' কেশবচন্দ্রকে শিবনাথ বিবিধ রচনায় ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে ৮. ১. ১৯১০ তারিখে কেশবচন্দ্রের জন্মদিবসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় শিবনাথ কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বঙ্গদেশ যখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের সমুত্থান হইয়াছিল। চারিশত বর্ষ পরে যখন বঙ্গভূমি—ভারতভূমি পতিতদশাপন্ন তখন এখানে

মহাপুরুষদের সমাগম হইল। আজ যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ম আমরা সমাগত, তিনি সেই শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।...সকল নিষ্ঠুর ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা এবং প্রভু পরমেশ্বরে তাঁহার একান্ত নির্ভর তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক।'

অপ্রকাশিত ডায়েরীর নানা স্থানে শিবনাথ কেশবচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন, কোথাও বা কেশবচন্দ্রের মন্তব্য উল্লিখিত রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে এগুলি গণ্য। ৫ই এপ্রিল ১৮৮৪ তারিখের ডায়েরীতে নববিধান সমাজের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে একটি জ্ঞাতব্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এসময়ে শিবনাথ প্রচার-মানসে মধুপুরে ছিলেন। 'এখানে নববিধান প্রচারক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম আসিলেন। তাঁহার সহিত নববিধানের বর্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি নববিধানের প্রচারক শ্রীযুক্তবাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে জানা গেল যে Supreme Council-এর অন্যতম সভ্য Ilbert সাহেব তাঁহাদের সালিসি হইয়া গোল মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের যে পত্র অদ্য পাইয়াছি তাহাতেও দেখিলাম যে প্রতাপবাবুর আবার দরবার মতাবলম্বীগণের সহিত মিশিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বর্তমান বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেলেও তাঁহারা সদ্ভাবের সহিত কাজ করিতে পারিবেন না। উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, কান্তিচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রচারকগণ প্রতাপবাবুকে শ্রদ্ধা করেন, স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতাপবাবুকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতেন। এখন আবার এই বর্তমান বিবাদে উভয় পক্ষের আচরণে সেই অশ্রদ্ধার ভাব প্রবল হইয়াছে। এখন যে তাঁহারা প্রণয় ও সদ্ভাবের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। স্বয়ং কেশবচন্দ্র আজীবন চেষ্টা করিয়াও যাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই তাঁহারা যে আপনাদের মধ্যে সেই সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন এরূপ সম্ভব বোধহয় না। দেখা যাউক কিরূপ হয়।'

এই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর থেকেই দেখা দিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধ ঘটেছিল প্রধানত আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই। কেশবচন্দ্র অন্তরে অত্যন্ত সরল

ছিলেন, অপরের অভিসন্ধি অনেক সময় তিনি অনুমান পর্যন্ত করতে পারতেন না। ফলে, বহুসময় অন্যের চোখে নিজে হেয় পর্যন্ত হয়েছেন। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে মুঙ্গেরে বাসকালে 'নরপূজার আন্দোলন' উপস্থিত হয়। যদুনাথ চক্রবর্তী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেশবের এই 'স্বয়ং ঈশ্বর' অভিধার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন শুরু করেন। এসময়ে কিন্তু শিবনাথ কেশবচন্দ্রেরই পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। অনেকদিন পর ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শিবনাথ পুনর্বার যখন মুঙ্গেরে যান, তখন পূর্বস্মৃতি উদিত হওয়ায় ২রা মে তারিখের ডায়েরীতে লিখেছেন, 'এই মুঙ্গের নগরে মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যদিগের ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস হয়।···এখান হইতেই নরপূজার গোলযোগের সূত্রপাত হয়। কালে মুঙ্গেরের সে সব ভাব বিলীন হইয়া গিয়াছে।'

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শিবনাথ প্রমুখের মতপার্থক্য তুঙ্গাকার ধারণ করে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে কেশব-কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহার-রাজের বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে। এই সময়ে কেশবচন্দ্র Miss Sophia Dobson Collet-কে 'কুচবিহার বিবাহ'-প্রসঙ্গে কয়েকটি চিঠি লেখেন। শিবনাথের ডায়েরী থেকে (১০. ৯. ১৯০৩) এই তথ্য ছাড়া আরও জানতে পারি যে, মিস্ কলেট এই চিঠিগুলি East & West পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

কেশবচন্দ্রও শিবনাথকে অনুজতুল্য স্নেহ করতেন। বিশেষত শিবনাথের রচনার প্রসাদগুণ তাঁকে মুগ্ধ করত। নিজের রচনারীতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিবনাথ প্রসঙ্গক্রমে কেশবচন্দ্রের উক্তিকে তাঁর ডায়েরীতে উদ্ধার করে রেখেছিলেন (২৬. ৯. ১৯০৩)—'ওজস্বী ভাষাতে লেখা আমার স্বভাব নয়। কেশববাবু বলিতেন—যা করে বা যা লেখে সকলি simple হইয়া যায়, ওর প্রকৃতিতে simplicity প্রধান গুণ।'

রাজনারায়ণ বসুর কন্যা ও জামাতা

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম স্বর্ণলতা। ইনিই স্বনামখ্যাত অরবিন্দ-বারীন্দ্রের জননী। রাজনারায়ণ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন খুলনার চিকিৎসক ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের সঙ্গে। বিবাহ হয় ব্রাহ্মমতে মেদিনীপুরে। প্রভূত জাঁকজমকের সঙ্গে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এই জামাতাকে রাজনারায়ণ পরবর্তীকালে স্বরচিত 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের

প্রাক্কালে ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বিলাত গমন করেন। জামাতার প্রতি রাজনারায়ণের স্নেহ ছিল অকৃত্রিম। কিন্তু ডাঃ ঘোষের অতি-স্বাধীন মনোভাবকে মাঝে মাঝে তিনি তর্জনীসংকেতে শাসন করতেন। জামাতার বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে রচিত রাজনারায়ণের একটি ইংরেজি চতুর্দশ-পদীর একটি পঙ্‌ক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে—'Thy freedom I esteem though thy excess I check oft'. জানি না এই 'excess'-টুকু স্ত্রীজাতির প্রতি দুর্বলতার ইঙ্গিত কিনা, অথবা সুরাপানের। সম্প্রতি প্রয়াত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় (দ্রষ্টব্য 'দেশ', ৮ আষাঢ় ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) 'বনস্পতির বৈঠক' নামক ধারাবাহিক রচনায় বারীন্দ্রনাথ ঘোষের 'রাঙা মা' যে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের উপপত্নী একথার উল্লেখ করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত ডায়েরীর একাংশ পাঠের পর এই তথ্যকে অবিশ্বাস্য মনে হয় না। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিবনাথ প্রচারের কারণে দেওঘরে যান এবং রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরস্থ গৃহে অবস্থান করেন। এখানে একদিন (৫. ৪. ১৮৮৪) রাজনারায়ণের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কন্যা স্বর্ণলতার উন্মাদাবস্থা বিষয়ে শিবনাথের কথাবার্তা হয়। 'যাইবার সময় পথে রাজনারায়ণ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাহার পতি Dr. Ghose-এর বিষয় অনেক কথা হইল। রাজনারায়ণ বাবুর সেই কন্যাটি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। অনেকে বলে Dr. Ghose-এর প্রতি অবিশ্বাস এই রোগের প্রধান কারণ। Dr. Ghose-এর ধর্মবিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধি এবং পরোপকার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল আছে। তাঁহার দ্বারা একসময়ে ব্রাহ্মসমাজের অনেক উপকার হইয়াছে। যোগীন কহিল তিনি ইংলণ্ড হইতে বিগড়িয়া আসিলেন।' ভক্তিভাজন রাজনারায়ণকে বৃদ্ধবয়সেও এই প্রকার মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল।

লাবণ্যপ্রভা বসু

আত্মজীবনী রচনায় শিবনাথ বরাবর অনিচ্ছুক ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার এই প্রকারের অনুরোধে তিনি একবার সাতিশয় লজ্জা পেয়েছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে একবার আত্মজীবনী রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শিবনাথ তাতেও সম্মত হননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মচরিত রচনা করেন। এ-সম্পর্কে যাঁর সাক্ষাৎ তাগিদ কার্যকরী হয়েছিল, তিনি লাবণ্যপ্রভা

বসু। লাবণ্যপ্রভা শিবনাথের চিত্তের অনেকাংশ অধিকার করেছিলেন। একটি প্রসঙ্গে তিনি ডায়েরীতে (১৭. ১০. ১৯০১) লাবণ্যপ্রভা সম্পর্কে লিখেছেন, 'লাবণ্যপ্রভার ঋণ কি কখনও শুধিতে পারিব ? আমাকে এরূপ কেহ কখনও ভালবাসে নাই। আমি বোধহয় এত ভাল কাহাকেও বাসি নাই। ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী, বন্ধুর ন্যায় হিতকারিণী, শিষ্যার ন্যায় অনুগামিনী আছে।'

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে শিবনাথ 'আত্মচরিত' রচনা আরম্ভ করেন বলে ডায়েরীতে উল্লেখ পাই। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে এর রচনাকর্ম সমাপ্ত হয়। তারপর তিনি ৩০-এ জুন তারিখে যাঁর একান্ত অনুরোধে এই আত্মচরিত রচিত হয়, তাঁকে প্রথম পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে আসেন—'আজ প্রাতে লাবণ্যকে আত্মজীবন চরিতখানা দিয়া আসিলাম।'

লাবণ্যপ্রভা বসু হলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সহোদরা। পরে বিশিষ্ট ব্রাহ্মপ্রচারক শিবনাথের জীবনীকার হেমচন্দ্র সরকারের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে শিবনাথের নিত্য গতায়াত ছিল। শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে থেকেই তাঁর চিকিৎসাকার্য সম্পন্ন হয়। ডায়েরীতে (১. ৩. ১৯১৪) শিবনাথ লিখেছেন, 'অজিতমোহন বসুর electric চিকিৎসাধীন থাকিবার জন্য প্রায় মাসাধিককাল Dr. J. C. Bose-এর বাড়ীতে ছিলাম।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেবেন্দ্রনাথ সেন

শিবনাথের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। এই যোগাযোগ যতটা ধর্মগত ছিল, তার চেয়েও ছিল সাহিত্যগত। উভয়েই তৎকালীন দেশী-বিদেশী সাহিত্য-সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন Spectator পত্রিকার গ্রাহক। শিবনাথ প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে স্পেকটেটর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে আসতেন। একদিনের কথা শিবনাথ এই ভাবে লিখেছেন (২১. ৯. ১৯০৩)—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া Spectator আনিলাম।'

এই বাড়ীতে আগত নানা ব্যক্তির সঙ্গেও শিবনাথ সাহিত্যালোচনা করতেন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন কলকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা' (পরে সুপরিচিত 'কমলা হাই স্কুল') বলে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা

করেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কারণে তাঁকে প্রায়ই গাজীপুর (উত্তরপ্রদেশ) থেকে কলকাতা আসতে হত। একদিন তিনি যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত ছিলেন, সেখানে শিবনাথ যান। শিবনাথ তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করতেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক আলোচনা এ দিন হয়। শিবনাথ তাঁর ১৩. ১০. ১৯০৩-এর ডায়েরীতে লিখেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়ে তিনি সেখানে 'এলাহাবাদের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন'-এর সঙ্গে 'বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষের বিষয়' আলোচনা করেন।

মহামতি গোখলে : ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার : কৃষ্ণকুমার মিত্র

শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ পরিচয় ধর্মনেতা হিসাবে। অপেক্ষাকৃত কম পরিচিতি সাহিত্যিকরূপে। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের খোঁজ অনেকেই রাখেন না। অথচ ভারতের জাতীয়-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর মত নির্ভীক দেশপ্রেমিক 'লাখে না মিলিবে এক'। বিপিনচন্দ্র পাল স্পষ্ট.ই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের দেশচর্যার দীক্ষাগুরু ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে একটি মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করছি। এই তথ্য অদ্যাবধি অনুদ্ঘাটিত বলে এর মূল্য অপরিসীম। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয়জন স্বদেশীকে ইংরাজ সরকার নির্বাসিত করেন। এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়, রাজভয়ে ভীত দেশের শীর্ষস্থানীয় দেশনায়কগণও (এমনকি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত) সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত হননি, পাছে সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়তে হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স তখন পূর্ণ ৬০ বছর। সাগ্রহে তিনি সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে গভর্নমেন্টের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ডায়েরীতে শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রাণকৃষ্ণের বাড়ীতে পরামর্শান্তর ঠিক হইল যে, গবর্নমেন্ট বিনাবিচারে কৃষ্ণকুমারবাবু প্রভৃতিকে নির্বাসন করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদের জন্য যে সভা হইবে তাহাতে আমাকে সভাপতির কার্য করিতে হইবে।' (২২. ১২. ১৯০৮)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে শিবনাথ-রচিত ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত দেশপ্রেমোদ্দীপক প্রবন্ধগুলির কথা এখানে স্মর্তব্য। এ-সময়ে গান্ধীজি যখন কলকাতা আসেন, তখন শিবনাথের সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজি তাঁর My Experiments with Truth (Vol. 1) গ্রন্থের ৫৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— 'I met Pandit Sivanath Sastri'। এই সাক্ষাৎকারে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে আলোচিত হয়েছিল, এমন অনুমানে বাধা নেই।

হিন্দু মেলার সময় থেকে আরম্ভ ক'রে (১৮৬১) জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিবনাথের জীবন স্বদেশ সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে মহামতি গোখলে এবং ডাঃ আর. জি. ভাণ্ডারকর কলকাতায় এলে শিবনাথের সঙ্গে তাঁদের ধর্মগত ও রাজনৈতিক—উভয় প্রকার আলোচনা হয়। অপ্রকাশিত ডায়েরী পাঠের পূর্বে আমরা এই তথ্য জানতে পারিনি। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের বাড়ীতে (ইনি শিবনাথের বিশেষ বন্ধু ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন) ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের প্রথমে মিঃ গোখলে এসে কিছুদিন ছিলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'Mrs P. K. Roy-এর বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। সেখানে গিয়া Mr. Gokhale-র সঙ্গে দেখা হইল। শুনিলাম Dr. Bhanderkar আসিতেছেন। তিনি Governor General-এর Council-এর Additional Member হইয়াছেন।' (৫. ১২. ১৯০৩)। এক সপ্তাহ পরে ভাণ্ডারকরের আগমন উপলক্ষে, শিবনাথ লিখেছেন, পুনরায় 'Mr. Gokhale-কে দেখিতে যাই। তাঁহার সঙ্গে Dr. Bhanderkar-কে receive করিতে যাইব এরূপ স্থির হয়, এবং পরদিন অর্থাৎ তেরই ডিসেম্বর তারিখে… …Mr. Gokhale-এর সঙ্গে Dr. Bhanderkar-কে receive করিবার জন্য হাবড়াতে যাওয়া গেল'। সতেরই ডিসেম্বর তারিখে ভাণ্ডারকরের বাসস্থানে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনা হয়। এক সপ্তাহ পরে পুনরায় শিবনাথ তাঁর কাছে যান। এখানে স্মরণীয় যে, ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে শিবনাথ যখন বোম্বাই যান, তখন ডাঃ ভাণ্ডারকরের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন।

গোখলের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা ব্যতীত ধর্মসম্পর্কীয় আলোচনাও হয়। ধর্মনেতা শিবনাথের সঙ্গে এই আলোচনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। গোখলের উক্তি যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে তখন গভীর রেখাপাত করেছিল, তা আমরা বহু পরেও তাঁর ১৩.১.১৯০৭ তারিখের ডায়েরী পাঠে জানতে পারি।

গোখলে শিবনাথকে বলেছিলেন, শিবনাথ ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন—'Personality is the greatest thing in preaching Religion—inspired and inspiring personalities wanted.' ধর্মপ্রচারক শিবনাথ অবশিষ্ট জীবন ধরে এই উক্তির সারবত্তা অনুভব করেছেন, চিন্তা করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল

স্বরাজ-সাধনের ব্যাপারে শিবনাথের অনুপ্রেরণার প্রতি বিপিনচন্দ্রের আস্থার অবধিমাত্র ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে শিবনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারতেন না। (এ-প্রকার অবশ্য অনেক পরবর্তীকালে ঘটেছিল)। চিন্তার ক্ষেত্রে এ-প্রকার মতপার্থক্য অসম্ভব মনে করি না। যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শিবনাথ প্রবাসী পত্রিকায় 'স্বদেশীধুয়া', 'জাতীয় একতা', 'ধুড়ি ধুড়ি মা কালী', 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি' প্রভৃতি প্রবন্ধে যে সব মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তার কোনো কোনোটির সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অপ্রকাশিত ডায়েরীতে শিবনাথ এ-বিষয়ে লিখেছেন, (১১. ২. ১৯০৭), 'বিপিন দুঃখ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজের দিক হইতে আমরা 'স্বরাজে'র পক্ষ সমর্থন করিতেছি না। এবং স্বদেশের প্রেমের ব্যাধি' লিখিয়া লোককে তদ্বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছি। এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলাম।' উল্লেখযোগ্য, এই সমালোচনায় শিবনাথের মনের কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। তার প্রমাণ, 'স্বদেশপ্রেমের ব্যাধি' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) প্রবন্ধ রচনার প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে রচিত একই ভয়াবহ 'ধুড়ি ধুড়ি মা কালী' প্রবন্ধটি (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৬)।

এবারে বিপিনচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন দু'টি তথ্য আমি সরবরাহ করতে যাচ্ছি, যা না করলেই ভাল হত। কারণ এর সাহিত্যমূল্য বা ঐতিহাসিকমূল্য নেই; কিন্তু মানবিক মূল্য আছে। সত্যের খাতিরে ডায়েরীতে উল্লিখিত এই তথ্য দুটি প্রকাশ করছি। দেশের প্রতি কর্তব্য করতে গিয়ে অনেক দেশনায়ক আপন অন্তঃপুরের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন না। বিপিনচন্দ্রও তাঁর স্ত্রীকে (প্রথম) খুব একটা সুখী করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি স্ত্রীকে নানাভাবে পীড়ন ও লাঞ্ছনা করতেন। সহ্য করতে

না পেয়ে একদিন একথা বিপিনচন্দ্রের স্ত্রী শিবনাথকে মুখ ফুটে বলে ফেলেন। (সেকালে বহুঘরের মেয়ে-স্ত্রীরা শিবনাথের কাছে তাঁদের অন্তর উজাড় করে কথা বলতেন—শিবনাথের প্রতি স্ত্রীজাতির এমনই আস্থা ও প্রেম ছিল)। এতে শিবনাথ মনে দারুণ আঘাত পান। এই প্রসঙ্গে ২৪. ৯. ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ডায়েরীতে শিবনাথ প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন, বিপিনচন্দ্র পালের স্ত্রী 'তাঁহার পতি তাঁহাকে কি প্রকার তাড়না করেন তাহা বলিলেন।'

বিপিনচন্দ্রকে মাঝে মাঝে সংসার পরিচালনার জন্য অথবা দেশের কাজে অর্থ কর্জ করতে হত বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে। সেকালের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকেই এই প্রকারের ঋণ করতে হত। এমনকি বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অপরকে দান করতে গিয়ে ঋণ পর্যন্ত করতেন। এ-বিষয়ে ঋণ গ্রহণ দোষাবহ মনে করি না। যাই হোক, নানা কারণে বিপিনচন্দ্রকে উত্তমর্ণেরা সাক্ষ্য না রেখে ঋণ দিতে কুণ্ঠিত হতেন। হরানন্দ বিদ্যাসাগরের পুত্র শিবনাথের সততা ও সত্যবাদিতা সেকালে প্রবাদের স্থান গ্রহণ করেছিল। সেজন্য বিপিনচন্দ্রকে যাঁরা টাকা ধার দিতেন, তাঁরা শিবনাথকে মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে ডাকতেন। এমন একটি কথার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন শিবনাথ তাঁর ১০. ১০. ১৯০৩ তারিখের ডায়েরীতে।

মাতা গোলকমণি দেবী

এরপরে আমরা শিবনাথের মা-বাবা-স্ত্রী-কন্যা ও কয়েকটি আশ্রিত কন্যা সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করছি। প্রথমে আমরা মাতা গোলকমণি দেবী সম্পর্কে ডায়েরী-উদ্ধৃত নানা কথা জানার চেষ্টা করছি। পৌত্তলিক বংশের সন্তান শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে তাঁর মা ও বাবাকে নিরতিশয় মনোকষ্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের হিন্দু-সংস্কারকে শিবনাথ অনেক সময়ে সমর্থন করেছিলেন অথবা সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যৌবনের অমিত তেজে অথবা ইষ্ট সত্যের একাগ্র লক্ষ্যে ধাবমান হয়ে মাতাপিতাকে অস্বীকার করার যে প্রবণতা জন্মেছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাতে কিছু কোমলতা সঞ্চারিত হয়েছিল। সেকারণে তিনি মাকে সঙ্গে নিয়ে ছাপান্ন বছর বয়সে কালীঘাটের মন্দিরে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন (৬. ৯. ১৯০৩)। এই মা-ই আবার পুত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতেও যোগ দিয়েছেন—'মন্দিরের মাসিক উপাসনার জন্য

সহরে গেলাম। মা ও বিরাজ সঙ্গে গিয়াছিলেন' (২৭. ১২. ১৯০৯)। এই দুই ঘটনার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে একটি নতুন অধ্যায় রচনা আরম্ভ হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর পিতৃভূমি মজিলপুরে প্রকাশ্যভাবে যাওয়া তাঁর পক্ষে বিপদজনক ছিল। ৯. ১১. ১৯০৩ তারিখেই তাঁর 'উপবীত পরিত্যাগ করার পর স্ত্রী, পুত্রবধূ, কন্যা প্রভৃতিকে লইয়া এই প্রথমে দেশ যাত্রা।' এরপরেই তিনি মাকে বুঝিয়ে তাঁর বালিগঞ্জস্থ বাড়ীতে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে গোলকমণি দেবী সংকটাপন্ন পীড়াতে আক্রান্ত হন এবং অনতিকালের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ জীবনের শেষের দিকে পিতৃভূমিতে গতায়াত আরম্ভ করেছেন, গ্রামস্থ প্রাচীন হিন্দুসমাজ সম্ভবত একে ভাল নজরে দেখেননি। শিবনাথ আশঙ্কা করেছিলেন, মায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মপুত্রের মাতা বলে তাঁর মৃতদেহ হিন্দুরা সৎকার পর্যন্ত করতে চাইবেন না। সেকারণে মনের সমর্থন না থাকলেও তিনি অন্ত্যপ্রায়শ্চিত্তাদির জন্য পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের মারফতে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন। এবিষয়ে ২৪. ৮. ১৯০৮ তারিখের ডায়েরীতে শিবনাথ লিখেছেন, '...মাতা ঠাকুরাণী সংকট পীড়াতে আক্রান্ত। গতকল্য প্রিয়, বৌমাকে লইয়া মাকে দেখিতে গিয়াছে। তাহার হাতে মার প্রায়শ্চিত্তের দং ২০ টাকা পাঠাইয়াছি। প্রাচীন সমাজের বিশ্বাস প্রায়শ্চিত্ত না করাইলে, মার শরীর শুদ্ধ হইবে না, তাঁহার মৃতদেহ কেহ কেহ স্পর্শ করিতে চাহিবে না। তাই প্রায়শ্চিত্ত করান। মার জন্য বড় দুশ্চিন্তাতে রহিয়াছি।'

কিন্তু মায়ের মৃত্যু হল। মায়ের চিন্তা সর্বক্ষণ শিবনাথের মনকে অধিকার করে থাকল। শিবনাথ লিখেছেন (১৯. ৯. ১৯০৮)—'আমার মাতার সংযম, স্বধর্মনিরতি, কঠিন নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা এই কয়দিন মনে জাগিতেছে, তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন ও যাহা সহিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। হায়! বাধ্য হইয়া এ জীবনে তাঁহাকে কি ক্লেশই দিতে হইয়াছে।' তিনদিন পরে পুনরায় লিখেছেন, 'আমার পরলোকগতা জননীকে যেন ভুলিতে পারিতেছি না। তিনি যেন সর্বদা নিকটে রহিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে-জিনিসের জন্য আমাকে এত ক্লেশ দিয়াছ তাহাতে বঞ্চিত থাকিও না।' সত্য-সন্ধানের যোগসূত্রেই দু'টি ভিন্নমার্গী অধ্যাত্মপ্রাণের গভীর সংযোগ সংস্থাপিত হয়েছিল।

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য

পুত্র. ধর্মান্তর গ্রহণ করলে জন্মদাতা পিতা কতখানি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারেন, হরানন্দ বিদ্যাসাগর তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে হরানন্দ এতই কুপিত হন যে তিনি পুত্রকে শুধু বিতাড়িত করেই স্বস্তি পান নি, পঁচিশ টাকা মাইনের পণ্ডিত বাইশ টাকা খরচ করে গুণ্ডা পুষেছিলেন পুত্র বাড়ীতে এলে তাকে হত্যা করার জন্য। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সেজন্য শিবনাথকে লুকিয়ে চুরিয়ে মজিলপুর যেতে হতো ; মাকে না দেখে যে তিনি সুস্থির হতে পারেন না। এদিকে পুত্রের মুখদর্শন যাতে না করতে হয় সেজন্য হরানন্দ স্ত্রীসহ কাশীবাসী হওয়ার জন্য কাশী গমন করেন। সেখানে গুরুতর রকমের অসুস্থ হয়ে পড়লে বিশেষ একটি অবস্থায় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে দীর্ঘ উনিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন হয়। শিবনাথ মাকে যেমন কালীঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসতেন, তেমনি পিতার ইষ্টদেবতার পূজার জন্যও শিবনাথকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেখি। ৩০. ৮. ১৯০৪ তারিখের ডায়েরীতে শিবনাথ এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বাঁকীপুর হইতে বাবার ঠাকুরের পূজার বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাশী যাই।' এর সাত বছর পর ১২ই আগস্ট ১৯১১ তারিখে হরানন্দের মৃত্যু হয়। এরপর স্বরচিত গুরুবন্দনায় পিতাকে তিনি স্থান দেন।

উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথের এই মনোভাবের পিছনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় কোনো অনুশোচনা বা হিন্দুধর্মের প্রতি কোনো আপোশের ইচ্ছা সক্রিয় ছিল না। শ্রদ্ধাশীল পুত্র বৃদ্ধবয়সে মা-বাবার মনে আর কষ্ট দিতে চান নি এবং তাঁদের নিকট স্নেহ-সান্নিধ্যে আসতে চেয়েছিলেন স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় নিয়ে।

বিরাজমোহিনী দেবী : দ্বিতীয়া পত্নী

শিবনাথের প্রথম বিবাহ হয় প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু হরানন্দ কোনো কারণে কুপিত হওয়ায় শিবনাথ প্রসন্নময়ীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে মনের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হয়। এবার বিবাহ হয় বিরাজমোহিনী দেবীর সঙ্গে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় প্রসন্নময়ী পুনরায় শ্বশুরগৃহে স্থান পান। একত্র বাস করলেও শিবনাথ কিন্তু বিরাজমোহিনীর সঙ্গে কখনও পতিসুলভ ব্যবহার করেন নি। এ নিয়ে অবশ্য বিরাজমোহিনীর মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। নিঃসন্তান

অবস্থায় বিরাজমোহিনীর মৃত্যু হয় শিবনাথের মৃত্যুর পরে। প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয় ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন। এর পর থেকে শিবনাথের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। তাঁর বয়স তখন ৫৪ বছর। এ-সময়ে একটি ব্যক্তিগত-জীবনের ছবি শিবনাথ তাঁর ডায়েরীতে এঁকে রেখেছেন। প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পর শিবনাথ একদা বিরাজমোহিনীকে যৌনসংসর্গের প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। কিন্তু বিরাজমোহিনীর মত নিষ্কাম, স্বামী বর্তমান সত্বেও যোগিনীর ন্যায় স্ত্রীরত্ন বুঝি ইহজগতে দুর্লভ। সপত্নীর পুত্র-কন্যাকে তিনি আপন সন্তানজ্ঞানে মানুষ করে তুলেছিলেন। হাতখরচের টাকা একটি একটি করে জমিয়ে শিবনাথের পৌত্র শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের বিদেশ যাত্রার জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন। শিবনাথের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বিরাজমোহিনী যে আদর্শ স্থাপন করেন তা উল্লেখযোগ্য। কারণ স্বামীর উন্নতিতে উৎসর্গীকৃত স্ত্রীর সহযোগিতা যে কতখানি প্রার্থনীয়—এ থেকে তা জানা যাবে। সেকারণেই একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের এই দৃশ্যটি (৭. ১১. ১৯০১) উদ্ধার করছি। —'গতরাত্রে বিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বহু বৎসর তোমার সহিত স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহার করি নাই, এখনও একগৃহে রাত্রি যাপন করিয়াও ভাইবোনের মত থাকিতেছি ইহাতে তোমার মনে কোনও ক্লেশ নাই ত?' তিনি প্রসন্নচিত্তে বলিলেন 'না আমার বেশ লাগিতেছে, আমি ভালই আছি।' আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—'তুমি আমার সহিত স্ত্রীর ব্যবহার করিতে চাহিলেও আমি তাহাতে রাজী নই, তোমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থাতে তাহা উচিত নয়।, কি পবিত্রচিত্ততা! পঁচিশ বৎসর স্বামীর সঙ্গে বিধবার ন্যায় থাকিয়া সপত্নী গত হইলে যে স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে আসিবেন তাহাও হইল না। আমার এই পীড়ার সঞ্চার অবধি এরূপ উত্তেজনা ভাল নয় মনে করিয়া এ পথ ত্যাগ করিয়াছি, তিনি তাহাতে আনন্দিত।"

শাস্ত্রী মহাশয় এ সময় নিদারুণ বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত। ১৬ই অক্টোবর ১৯১০ তারিখের ডায়েরীতে তিনি এবিষয়ে লিখেছেন, 'আজ নগেন নাগের দ্বারা আমার প্রস্রাব আবার পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে চিনির পরিমাণ ৮ গ্রেণ হইতে ২৪ গ্রেণে উঠিয়াছে।'

স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিরাজমোহিনীর উদ্বেগের অবধি ছিল না। গ্রন্থকীট-শিবনাথ একজন বুভুক্ষু পাঠক ছিলেন। এক একদিন পড়াশুনোর তিনি এতো

সময় ব্যয় করতেন যে, বিরাজমোহিনী স্বামীর চোখের অসুখের আশঙ্কায় গভীর বিরক্তি প্রকাশ করতেন। যেমন একদিনের কথা (২৭. ৯. ১৯০৩) শিবনাথ লিখেছেন, '...এত পড়ি বলিয়া বিরাজ ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।' বিরাজমোহিনীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শিবনাথ চোখে দুটো জিনিষ দেখতে লাগলেন এবং মস্তিকের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। স্বামীর পরিবারগত ব্যাপারে মাত্র নয়, ধর্মগত ব্যাপারেও বিরাজমোহিনী স্বামীকে সহায়তা করতেন। তিনিও স্বামীর সঙ্গে সামাজিক উপাসনায় যেতেন।

হেমলতা দেবী : জ্যেষ্ঠা কন্যা

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা আষাঢ় শিবনাথের প্রথমা কন্যা ও প্রথম সন্তান হেমলতা ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। কন্যার জন্মমুহূর্তে শিবনাথ আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের দেশে সাধারণত কন্যা-সন্তানের (বিশেষত প্রথম সন্তান কন্যা হলে) আবির্ভাবকে সোৎসাহে সম্বর্ধিত করা হয় না। কিন্তু শিবনাথ ছিলেন শৈশব থেকে বিদ্যাসাগরের চেলা, স্ত্রীজাতির বিষম পক্ষে। সুতরাং কন্যার জন্মের সংবাদ পেয়ে তিনি মাকে লিখে জানালেন যে, পুত্র অপেক্ষা কন্যার আবির্ভাবকে তিনি অধিক গৌরবের বিষয় বলে মনে করেন। পুত্র-কন্যাদের জন্য শিবনাথের অন্তরে এক অপরিমেয় স্নেহ-উৎস নিত্য বহমান ছিল। তিনি ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নর-নারীর শুদ্ধ প্রেমকে তিনি তাঁর কাব্য উপন্যাসে নানাভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে হেমলতার বয়স যখন প্রায় ষোল বছর তখন তিনি কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ সময়ে 'সখা'-সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। ইনি হেয়ার স্কুলে শিবনাথের ছাত্র ছিলেন। এঁর সম্পর্কে শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখেছেন— 'প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল।' এই প্রমদা হেমলতার প্রতি এ-সময়ে আকৃষ্ট হন এবং শিবনাথকে তাঁর মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ৮. ৪. ১৮৮৪ তারিখের ডায়েরীতে চিন্তাকুল পিতা লিখেছেন, 'প্রমদাচরণ সেনের ইচ্ছা হেমকে বিবাহ করে।' অনেক পরে ১৮. ৫. ১৮৮৫ তারিখেও শিবনাথ প্রমদাচরণের অনুরাগ-সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ জুন তারিখে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে এই উদীয়মান শিশুসাহিত্যিকের মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর

ইচ্ছা ফলবতী হতে পারেনি। তাছাড়া, স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও শিবনাথ কোনো প্রকার অনাচার বা অবিমৃষ্যকারিতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। সে কারণে প্রমদা-হেমের পরিণয়ে তাঁকে অনিচ্ছুক হতে দেখি। পরে অবশ্য হেমলতা দেবী নিজের নির্বাচিত পাত্র ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারকে বিবাহ করেন এবং শিবনাথ একে স্বাগত জানান। এ-সম্পর্কে শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখেছেন, 'ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, যিনি কোকনদাতে পীড়ার সময় আমার চিকিৎসার জন্য সমাজের বন্ধুগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি আমার পীড়ার সময় হেমের সহিত পরিচিত হন। সেই পরিচয় ক্রমে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হয়, এবং অবশেষে তিনি হেমকে বিবাহ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং আমার অনুমতি পাইয়া তাঁহারা বিবাহিত হন।'

স্নেহশীল পিতার স্নেহ আরও নানাভাবে সন্তানদের প্রতি উৎসারিত হত। পুত্রকন্যার জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্য বিত্তবানেরা নানাবিধ আড়ম্বর-সমারোহের ব্যবস্থা করে পিতৃত্বের ও ধনের অহমিকা ঘোষণা ক'রে থাকেন। কিন্তু কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা ক'রে উপহার দানের অভিনব অথচ অভিনন্দনযোগ্য পরিকল্পনা সম্ভবত শিবনাথের মত উদারহৃদয় স্নেহশীল পিতৃ-হৃদয়েই উদিত হয়। হেমলতার সতেরো বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষ্যে শিবনাথ লিখেছেন (৯. ৪. ১৮৮৪)—'সেইদিন যদি তাহাকে একখানি উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া উপহার দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। সেখানি অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগেরও পাঠ্যপুস্তক হইতে পারে। কিন্তু ইহা গোপনে করিতে হইবে, সে সেইদিন প্রাতে গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম দেখিবে।' সময়াভাবে অবশ্য শিবনাথ তখন এই পরিকল্পনার রূপ দিতে পারেন নি। পরে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হিমাদ্রি কুসুম' তিনি কন্যা হেমলতাকে উৎসর্গ করেন। 'শিবনাথ-জীবনী' হেমলতা দেবীর যোগ্য পিতৃ-তর্পণ।

কয়েকটি আশ্রিত কন্যা

শুধুমাত্র স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়জন নিয়ে যে সংসার তা ধীরে ধীরে স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। কিন্তু শিবনাথের পরিবারের আবহাওয়া ছিল তাঁর চিত্তের মতই উদার ও বিস্তৃত। সেকালে যেসব ব্রাহ্মযুবকেরা বহু নিরাশ্রয় ও পতিতা রমণীদের উদ্ধার করে সমাজের সুস্থ জীবনে বেঁচে থাকার সুযোগ করে

দিয়েছিলেন, শিবনাথ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বিদ্যাসাগরের সহায়তায় বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ দাসের বিবাহের জন্য কন্যা সংগ্রহের কাহিনী সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। স্ত্রী-জাতির প্রতি শিবনাথের অনাবিল শ্রদ্ধা ও প্রেম সর্বাধিক প্রকাশিত পেয়েছিল তাঁর পরিবারে বহুসংখ্যক নিরাশ্রয় ও পতিত বালিকাকে আশ্রয়দানে। এঁদের অনেকে জীবনের পিচ্ছিল পথে চলতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন বলে এঁদের প্রতি শিবনাথের সহানুভূতি ছিল প্রবল ও অকৃত্রিম। তাঁর কথাই ছিল, 'মানুষকে পাষাণের মত না হইয়া আকাশের মত হইতে হইবে।' শিবনাথের 'আত্মচরিতে', হেমলতা দেবীর 'শিবনাথ-জীবনী'তে এবং 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে এ ধরণের কয়েকটি বালিকার উল্লেখ আছে। এঁদের ছাড়া অপ্রকাশিত ডায়েরীতে আর যাঁদের উল্লেখ আছে, আমরা এখানে তাঁদের কথা জানাচ্ছি। ১৭. ৫. ১৮৮৪ তারিখের ডায়েরী পাঠে জেনেছি জয়া, স্বর্ণ ও রাজু এই তিনজন আশ্রিত মেয়ে শাস্ত্রী-পরিবারে রয়েছেন। থাকমণির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ২৯. ১১. ১৯০৪ তারিখের ডায়েরীতে দেখেছি এ দিন শিবনাথ তার আশ্রিত কন্যা ইন্দুপ্রভা বিশ্বাসের বিবাহ দিয়েছেন। এই ধরণের আশ্রিত কন্যাদের নানা কাহিনী আমি 'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তোগত পুত্র স্বনামখ্যাত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি। এঁদের সন্তানেরা পরবর্তীকালে বহু উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বর্তমানে সে-সব কথা অপ্রকাশ্য ভেবে তাঁদের বিস্তারিত উল্লেখে বিরত হলাম।

অন্যান্য ব্যক্তি-প্রসঙ্গ

শিবচন্দ্র দেবের সঙ্গে শিবনাথের গভীর সৌহার্দ্য ছিল বয়সের লক্ষণীয় ব্যবধান সত্ত্বেও। তিনি প্রায়ই কোন্নগরে তাঁর বাড়ীতে যেতেন ও উপাসনাদি করতেন। যেমন গিয়েছিলেন ৩রা মার্চ ১৮৮৪ রবিবার দিন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শিবচন্দ্রই ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সভাপতি।

প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। যখনই তিনি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারে যেতেন, তখনই এলাহাবাদে গিয়ে রামানন্দের কাছে থাকতেন। এমনই এক প্রচারযাত্রায় বের হয়ে ২৮. ১০. ১৯০১ তারিখে রামানন্দের এলাহাবাদের বাড়ীতে উঠেছিলেন। এখানে

রামানন্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর সাহিত্য-আলোচনাও হত—'রামানন্দের সহিত Affections সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমি বলিলাম modern age-এর একটা লক্ষণ depreciation of the affections—তিনি বলিলেন এই জন্যই Poetry ও Literature ভাল হইতেছে না। আমি বলিলাম imagination ও question (*sic*) সাহিত্যের প্রাণ, তাহার অবনতিতে সাহিত্যের অবনতি অনিবার্য।' স্মর্তব্য, শিবনাথের বহু প্রবন্ধ 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে শিবনাথের যোগাযোগ ছিল। রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে City College-এ তাঁর বক্তৃতাদানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিবনাথকে বাঙ্‌লা ভাষার প্রশ্নকর্তা হিসাবে নিয়োগ করে—'University আমাকে আগামী বর্ষের F. A. বাঙ্‌লার একজন Question Setter করিয়াছেন' (১১. ৬. ১৯০৮)। তিনি পরীক্ষকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সূত্রেই আচার্য দীনেশ সেনের সঙ্গে শিবনাথের সংযোগ বৃদ্ধি পায়। এই বছরেই ১০ই ও ১৭ই জুলাই তারিখে দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় প্রশ্নপত্রের রূপ দেন—ডায়েরীতে একথার উল্লেখ রয়েছে। ১৯১০ সালের L. A. পরীক্ষার 'University Female Candidate'-দের প্রশ্নপত্রও তিনি রচনা করেছিলেন।

শিবনাথ একজন প্রথম শ্রেণীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। ৩০. ১২. ১৯০৩ এবং ১৫. ১. ১৯০৪ তারিখের ডায়েরীতে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি গীতরচনা-কালে জনৈক কালীবাবুর সহায়তা পেতেন। এই কালীবাবু—কালীনাথ ঘোষ না কালীপ্রসন্ন ঘোষ (এঁরা দুজনেই ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন) তা নির্ধারণ করতে পারিনি। এ বিষয়ে কেউ আলোকপাত করতে পারলে আনন্দিত হবো। শিবনাথ লিখেছেন, '...বৈকালে কালীবাবু আসেন। তাঁহার সঙ্গে বসিয়া নগর কীর্তনটি ও একটি গান বাঁধি।'

মধুসূদন সম্পর্কে শিবনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'নির্বাসিতের বিলাপ'-এ অমিত্রাক্ষর ছন্দের দুর্বল অনুকরণ রয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি সার্কুলার রোডে অবস্থিত মধুসূদনের সমাধিস্থল দর্শন করতে যেতেন। ১১. ১. ১৯০৪ তারিখেও তিনি এখানে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য এসেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত মধুসূদনের জীবনী তিনি কয়েকবার

আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলেন। যেমন একদিন (২৬. ৬. ১৯০৮) তিনি উক্ত গ্রন্থটি পুনরায় পড়েছিলেন—'অদ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন আবার পড়িয়া শেষ করিলাম।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। নির্জনে বসে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস (সুবিখ্যাত History of Brahmo Samaj গ্রন্থ) রচনা করবেন বলে অক্ষয়কুমার দত্তের বালীর বাড়ীতে বাস করার অনুমতি চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে যে শিবনাথ চিঠি লিখেছিলেন, ২১. ৭. ১৯০৯ তারিখের ডায়েরী পাঠে আমরা তা জানতে পেরেছি।

আরও বহু ব্যক্তির বিচিত্র কথা এই ডায়েরীর বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ ডায়েরী প্রকাশিত হলে তাদের কথা আমরা ভালভাবে জানতে পারবো। এখানে শুধুমাত্র সংবাদ-চূর্ণকগুলি পরিবেশিত হল। এর পরে আমরা শিবনাথের আত্ম-প্রসঙ্গ ও বিচিত্র-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হবো।

খ-অংশ

এই অংশে আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত চিন্তা, ধারণা, (ধর্মবিষয়ক এবং সমাজবিষয়ক, উভয়প্রকার) বিবিধ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ, সাহিত্য-পরিষৎ-এর সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি, সৌন্দর্য সাধনা, সাহিত্যচর্চা এবং অন্যান্য বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করছি। 'আত্মচরিত'-এর পাঠকেরা জানেন, শিবনাথ-রচিত এই আত্মজীবনীর মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থ আর নেই। এই অংশে আমরা সেই 'আত্মচরিতের' এক নতুন পরিশিষ্ট রচনা করলাম মাত্র।

আত্মপ্রসঙ্গ

শিবনাথের জীবন ছিল দেশ ও সমাজের কাজে উৎসর্গীকৃত। সেকারণে স্বার্থপরতা তাঁর জীবনকে এতটুকু কালিমালিপ্ত করতে পারে নি। যা ভেবেছেন, যা করেছেন সব কিছু ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরে স্থির, উদ্দেশ্য ছিল মানব-সেবা। আপন জীবনে বহুবার তিনি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। বহিরঙ্গে তাই তিনি 'ব্রাহ্মসমাজের দাস', কিন্তু অন্তরঙ্গে উচ্চভাবের সাধক।

ইহজগতের কাজ আর মনোজগতের সাধনা—উভয়ের মধ্যে শিবনাথ মাঝে মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারতেন না। এজন্য মনে বহু সময়ে কষ্ট পেতেন, একটা অতৃপ্তি তাঁর পশ্চাদ্-ধাবন করত। ভাবতেন, ঈশ্বরসাধনায় ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। অপ্রকাশিত ডায়েরীর বহুস্থানে এই প্রকারের আত্মবিচারণা ও ঈশ্বরানুভূতির কথা চিত্রিত আছে। কিন্তু যে-ব্যাপারটি সবিশেষ লক্ষণীয়, তা হ'ল, যখনই কোনো প্রসঙ্গে শিবনাথ মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন, পরমুহূর্তেই একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা তাঁকে চাঞ্চল্যের সীমাবদ্ধতা থেকে প্রশান্তির ও প্রাপ্তির অসীমে মুক্তি দিয়েছে। শিবনাথের এই অন্তরময়তার কয়েকটি প্রসঙ্গ আমি এবার তুলে ধরছি।

৩রা মার্চ ১৮৮৪ তারিখে শিবনাথ কলকাতা থেকে কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেবের বাড়ীতে আসেন—একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে পারিবারিক উপাসনা হওয়ার কথা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ছিল। 'তদনুসারে প্রাতঃকালে তাঁহার ভবনে উপাসনা হইল। গায়কের অভাবে গান হইল না বিশেষত উপাসনাকালে কেহ কেহ চঞ্চলতা প্রকাশ করাতে উপাসনার বড় ব্যাঘাত বোধ হইল।' আরাধনাকালে এধরণের চাঞ্চল্য শাস্ত্রীমহাশয়ের মনকে পীড়িত করত! অথচ শিবনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর অনেকে বিত্তবান হয়েছেন, কিন্তু যথার্থ সাধক একটিও মেলেনি। একারণে বাধ্য হয়ে যাঁরা সাধন-ভজন মাত্র নিয়ে থাকবেন তাঁদেরকে নিয়ে তিনি একটি ঘননিবিষ্ট-মণ্ডলী (inner circle) ও সাধন আশ্রম (১৮৯২) স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে শিবনাথের মন ব্রাহ্মসমাজের ব্যাপারে কি প্রকারের বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে গিরিডিতে অবস্থানকালে লিখিত ৫ই এপ্রিল ১৮৮৪ তারিখের ডায়েরীতে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কথাও এতে উল্লিখিত হয়েছে। 'অদ্য অপরাহ্ণে গিরিডি যাত্রা করিলাম। পথে গাড়িতে এক পার্শ্বে বসিয়া একাকী ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছি। চিন্তা করিতে করিতে প্রাণটা কেমন একপ্রকার বিষাদে পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বড় দুর্বল। ইহার নানা শত্রু। পূর্বে ইহার প্রাচীন হিন্দুসমাজ এবং খ্রীষ্টীয় সমাজের সহিত বিবাদ ছিল, এক্ষণে আবার আর্যসমাজ ও Theosophical Society-র সহিত বিবাদ উপস্থিত। চতুর্দিকে এত যে শত্রু—কিন্তু ব্রাহ্মদিগের সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কই? মফস্বলের

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অর্ধেক হৃদয় ঈশ্বরকে দিয়াছেন। অনেকের ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ এত দুর্বল যে ব্রাহ্মসমাজ আজ ভারত হইতে উঠিয়া গেলে তাহাদের ক্ষতি বোধ হইবে না। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার উপায় কি ইহা ভাবিতে গিয়া নিজেদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অমনি নিজ জীবনের ত্রুটি ও দুর্বলতা সকল স্মরণ হইল। ভাবিলাম এখনও ত পূর্ণরূপে বিধাতার ভূমি প্রাপ্ত হই নাই, এবং এখনও কামক্রোধের বশবর্তী আছি। আমার দ্বারা কিরূপে ধর্মপ্রচার হইবে। এই চিন্তায় মগ্ন হইতে হইতে প্রাণ গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম ঈশ্বর কি আছেন? তিনি কি আমাদের সহায়? আমার মন বলিল ব্রহ্মাণ্ডকে ধর্ম নিয়মে যিনি বাঁধিয়াছেন তিনি কি ধর্মের সহায় নহেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 'তুমি আমার হও আমি তোমার হই' এই মন্ত্রটি হঠাৎ মনে পড়িল। মন্ত্রটি জপিতে জপিতে স্টেশন হইতে নামিলাম। প্রাণে যেন এক নূতন আলোক ও সান্ত্বনা পাইলাম। এই মন্ত্রটি কয়েকদিন সাধন করিতে হইবে।' ব্রাহ্মসমাজের এই নৈতিক অবনতি তাঁর মনে তীব্র আঘাত হানতো। একদিন (২. ১০. ১৯০৩) আনন্দমোহন বসু বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ ত dead'। এর কারণ হিসাবে নিজেদের দোষী করে শিবনাথ বলেছিলেন—'Dead হইতেছে আমাদের পাপের ফলে।'

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সমাজ-সংস্কার, সমাজোন্নতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতাসাধন প্রভৃতির সঙ্গে শিবনাথের গভীর সংযোগ থাকলেও, স্থির লক্ষ্য ছিল তাঁর আত্মোন্নয়নে, ঈশ্বরের কৃপালাভে। শিবনাথ সেজন্য নিজেই লিখেছেন—ডায়েরীর তারিখ ৮ই মে ১৮৮৪—'আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি যে দেশের লোকে রাজনীতি সম্বন্ধে অধিকার সকল লাভ করে, ইহার সহিত আমার আত্মার গভীর যোগ থাকিলেও কেবল তাহা আমার জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এইরূপ কেবল সমাজসংস্কার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য নহে।'

সুতরাং ইহজগতের খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে তিনি বার বার মুক্তি পেতে চেয়েছেন। প্রথম যেদিন শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ ও সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ করলেন, সেদিন সেটি 'প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির ও আচার্যের কার্য শিক্ষার উপায় স্বরূপ' হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে তিনি নেতৃত্বের সামনের সারিতে এসে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ যে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, একথা ভেবে শিবনাথ গভীর দুঃখ বোধ করতেন—'আমার প্রথম অধোগতি তখন আরম্ভ হইল যখন

আমি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরিচিত ও অনেকের শ্রদ্ধাভাজন হইলাম।' (৫. ৫. ১৮৮৪)। সেকারণে আচার্যপদ ত্যাগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে অব্যাহতি দেয়নি। সংকল্প বার বার পরিত্যক্ত হয়েছে। ৯. ১১. ১৯০১ তারিখে লিখেছেন—'এইরূপ সংকল্প করিতেছি যে প্রচারক ও আচার্যের পদ ত্যাগ করিব।' স্মর্তব্য, এই বছরেই প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয় ও শিবনাথের শরীর ভাঙতে শুরু করে। ১লা অক্টোবর ১৯০৩, বৃহস্পতিবারেও আচার্যত্ব ত্যাগের একই সংকল্প দেখি—'Love of power অথবা প্রশংসাপ্রিয়তা' ঈশ্বর সাধনার 'গলা টিপিয়া' রেখেছে, তা থেকে মুক্তি চাই।

অতি শৈশবে যে কবি একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বার্ধক্যে তাঁর যেন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বিনিময় হয়েছিল। ঈশ্বরকে একই কালে তিনি মাতৃ ও পিতৃ-রূপে ভাবনা করেছেন। নিজেকে পুত্ররূপে কল্পনা করে শিবনাথ ব্রহ্মকে পিতারূপে পেতে চেয়েছিলেন—'ঈশ্বর পিতা, আমি পুত্র এ সম্বন্ধ কেহই লোপ করিতে পারে না' (২৯. ৪. ১৮৮৪)। এই আত্মবিশ্বাস সুদীর্ঘকালের সাধনায় ক্রম-দার্ঢ্যতা পেয়েছে—'অদ্য (৪. ৫. ১৮৮৪) ধর্মজীবনের প্রারম্ভ অবধি অদ্য পর্যন্ত যত স্মরণ হয় সমুদয় ঘটনা ও অবস্থা স্মরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম অশেষ প্রকার দুর্বলতার মধ্য হইতে ঈশ্বর ক্রমাগত তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপার স্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়া প্রাণমন মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রাণটী এই প্রাতঃকালের উপাসনাতে বড় ভাল হইয়া গেল।' একেই বলা হয়, ব্রহ্মসম্মিলন বা Communion। শিবনাথের আত্মকাহিনী তাই 'তাঁর করুণার সাক্ষ্য' (১২. ৯. ১৯০৩) মাত্র।

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা জানেন যে, ভারতহিতৈষিণী এবং রামমোহনের প্রামাণ্য জীবনীরচয়িত্রী মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেটের সম্পাদনায় ব্রাহ্মসমাজের বর্ষপঞ্জী Brahmo Year Book-এর কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু একথা অনেকেরই জানা নেই যে, শিবনাথ শাস্ত্রী একসময়, অল্পদিনের জন্য হলেও, এই সম্পাদনা ব্যাপারে যুক্ত হয়েছিলেন। তথ্য হিসাবে এ-প্রসঙ্গ মূল্যবান। অপ্রকাশিত ডায়েরীর ১৮. ৫. ১৮৮৪ তারিখে শিবনাথ

লিখেছেন যে, এ সময়ে মিস্ কলেট ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ এটি যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। সেইমত শিবনাথ 'Retrospect ও কেশবচন্দ্র সেনের Sketch' লিখবেন স্থির হয়েছিল। এ কারণে তিনি পরদিনই তথ্য-সংগ্রহের কারণে বিভিন্ন সমাজে চিঠিপত্র লেখেন—'অপরাহ্নে ব্রাহ্ম ইয়ার বুকের জন্য লাহোর বোম্বাই গুজরাটে পত্র লিখিলাম।' একদিন বাদ দিয়ে একুশ তারিখে মিস্ কলেট যে সব চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন—'অন্ত প্রাতে উঠিয়া Brahmo Year Book সংক্রান্ত Miss Collet-এর পত্রাদি পাঠ করা গেল।'

অপর একটি পত্রিকা-সম্পাদনেও শিবনাথের গোপন সহায়তা ছিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন 'সঞ্জীবনী'র বহুখ্যাত সম্পাদক। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন স্বদেশীকে নির্বাসিত করেন। তখন 'সঞ্জীবনী'র প্রকাশ ব্যাপারে শিবনাথ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সঙ্গে তিনি 'কৃষ্ণকুমার বাবুকে যে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সঞ্জীবনী কিরূপে চালান যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ' করেছেন (২০. ১২. ১৯০৮)। কৃষ্ণকুমার বাবুর কন্যা কুমুদিনী মিত্র ছিলেন কৃতবিদ্য। শিবনাথ তখন পূর্বপরামর্শ অনুযায়ী পরোক্ষভাবে সম্পাদকের ভার গ্রহণ ক'রে কুমুদিনীকে এ ব্যাপারে সহায়তা করলেন—'সঞ্জীবনী আপীসে কৃষ্ণকুমার বাবুর পরিবারদিগকে দেখিতে গেলাম। সেখানে মুখে মুখে সঞ্জীবনীর জন্য কিছু বলিলাম, কুমুদিনী লিখিয়া লইলেন' (২১. ১২. ১৯০৮)। পরের দিনও 'কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে গিয়া সঞ্জীবনীর জন্য কিছু কিছু dictate করি, কুমুদিনী লেখেন।' এই পত্রিকাটির এই আংশিক সম্পাদকত্বে শিবনাথের সম্পাদক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে—যদিও 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা'র সঙ্গে আমৃত্যু সংযুক্ত ছিলেন।

এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে শিবনাথ পত্র-পত্রিকায় রচনা পাঠিয়ে নেহাৎ বাধ্য না হলে কোনো পারিশ্রমিক নিতেন না। তাঁর মতো প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান্ লেখকের বিনা পারিশ্রমিকে একই সঙ্গে অনেকগুলি পত্রিকায় লেখা আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। আসলে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো সত্যনিষ্ঠ ও নির্লোভ ব্যক্তির সাক্ষাৎ খুবই দুর্লভ। সেকারণে বহু পত্রিকা

তাঁকে রচনা পাঠাবার জন্ম অনুরোধ পাঠাতো। তিনিও সাধ্যপক্ষে অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। প্রখ্যাত 'East and West' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন Mr. Malabari, তিনি তাঁর পত্রিকায় রচনার জন্ম শিবনাথকে অনুরোধ করে-ছিলেন। ১৬. ১২. ১৯০১ তারিখের ডায়েরীতে শিবনাথ এ-বিষয়ে লিখেছেন, Mr. Malabari তাঁর 'East and West' 'পত্রিকার contributor হইবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছেন।···আমি East & West এ লিখিব মনে করিতেছি।' সেদিনই একটি প্রবন্ধের খসড়া মনে মনে করেন এবং পরদিন রচনারম্ভ করেন। ডায়েরীর এদিনের পৃষ্ঠাটি কীটদষ্ট হওয়ার প্রবন্ধটির সঠিক নাম উদ্ধার করা গেল না। শিবনাথের অনুগত জনৈক মুনীন্দ্র শিবনাথের শ্রুতিলিখনটি লিপিবদ্ধ করেন।—'···East and West-এর জন্ম English ·· ···in Bengal বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহার কতকটা dictate করিলাম মুনীন্দ্র লিখিলেন।' Hindusthan Review পত্রিকা তাঁকে রামমোহন-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্ম অনুরোধ জানান। এই বিষয়ের উপর রচিত তাঁর দু'টি প্রবন্ধ এই পত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথমটির প্রকাশকাল আমি জানতে পারিনি। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি শিবনাথ রচনা করেন ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের তিন ও চার তারিখে—'Hindus-than Review-এর জন্ম রামমোহন রায় বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিতে বসি।' ১৬ই নভেম্বরের ডায়েরী পাঠে জানতে পারি ঐদিন রচনাটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিবনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর অনুরোধে শিবনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে প্রবাসীতে প্রকাশিত শিবনাথের প্রবন্ধাবলী তৎকালীন রাজনীতিকদের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়েছিল। তাঁর সমাজপ্রসঙ্গ-মূলক বহু প্রবন্ধও এই পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে শিবনাথের সমাজচিন্তা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের তিনটি অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এর প্রথমাংশটির রচনারম্ভ হয় ২৩.১০.১৯০৩ তারিখে—'প্রবাসীর জন্ম একটি আর্টিকেল লিখিতে বসিলাম।' এই আর্টিকেলটির নাম যে 'বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ' ৬. ১১. ১৯০৩ তারিখের ডায়েরী পাঠে তা' জানতে পারি—'প্রবাসীর জন্ম বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ নামক একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম।' বলা বাহুল্য এটি পূর্বোক্ত আর্টিকেলের অনুক্রমণ।

প্রবাসীর পৌষ.১৩০৯ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটির 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। এর রচনারম্ভ হয় ২২. ১১. ১৯০৩ তারিখে···'প্রবাসীর জন্য সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিতে বসি।' ২৫ তারিখে এটি 'revise' করার পর ডাকে পাঠান এবং ৭ই ডিসেম্বর তারিখে 'তৃতীয় প্রস্তাবের অনেকটা রচনা করেন। ৯ তারিখে প্রবন্ধ রচনা সমাপ্ত হয়। রামানন্দ শিবনাথের বন্ধু হলেও সম্পাদক হিসেবে নির্মম ছিলেন। এই তৃতীয় প্রস্তাবও তাঁর মনোমত হয়নি এবং সেজন্য ফেরৎ পাঠিয়ে দেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের জন্য। শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশমতো সংশোধন করে সেটি আবার পাঠিয়ে দেন বাইশ তারিখে— '···প্রবাসীর তৃতীয় প্রবন্ধ ফেরৎ আসিয়াছে, তাহাতে কিছু যোগ করিলাম।' উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধগুলি পরে শিবনাথের 'প্রবন্ধাবলি' (১৯০৪) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

কোন্ তারিখে কোন্ প্রবন্ধের রচনা আরম্ভ হয়েছে, তার তালিকা নির্ণয়ে সাহিত্যগত মূল্য নিরূপিত হয় না। কিন্তু তাতে লেখকের রচনার দ্রুততা ও চিন্তার বহমানতা সম্পর্কে একটি পরিচয় পাওয়া যায়। নানা কাজের মানুষ শিবনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধত্রয় মাত্র দুমাসের মধ্যে রচনা শেষ করেন। এর মধ্যে তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের নিয়মিত প্রুফ দেখেছেন, 'বিধবার ছেলে' নামক উপন্যাস রচনা করে চলেছেন, Hindusthan Review এর জন্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন, উপবীত ত্যাগ করার পর স্ত্রীপুত্র সঙ্গে নিয়ে প্রথম পিতৃভূমি মজিলপুরে গিয়ে দিন তিনেক থেকেছেন, 'প্রবন্ধাবলি' নামক পরিকল্পিত পুস্তকের প্রবন্ধগুলি সাজিয়েছেন ও পরে প্রুফ দেখেছেন, এবং গোখলে ও ভাণ্ডারকারের সঙ্গে রাজনীতি ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা করেছেন। শেষে লিখেছেন : ২৩. ৯. ১৯১১ 'এক সময়ে আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম, প্রকৃতিকে ও মানুষকে কবির চক্ষে দেখিতাম। কালক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ, ছাড়াছাড়ি, ছুটাছুটি, খাটুনি প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া আমার কবিত্ব আর স্ফূর্তি পাইবার সময় পাইল না। এখন সময় আসিয়াছে—যখন একান্তে ও প্রকৃতির বক্ষনিকেতনে বসিয়া আবার কবিত্বের স্ফূর্তির দিকে মন দিতে হইবে।' শিবনাথের বয়স তখন ৬৪। বস্তুত তিনি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—অর্থাৎ মৃত্যুর অন্তত তিন বছর পূর্ব পর্যন্ত কাব্যচর্চা করে গেছেন—অপ্রকাশিত ডায়েরীতে তার উল্লেখ রয়েছে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

ব্যক্তি-প্রসঙ্গে এমন বহু কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেগুলি শিবনাথের সাহিত্য জীবনের বহু অজ্ঞাত তথ্যাবলী উদ্ঘাটিত করেছে। তাঁর এই ডায়েরীতে আমরা পেয়েছি তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রবন্ধাবলী, ধর্মজীবন, বিধবার ছেলে, History of Brahmo Samaj, Men I Have Seen প্রভৃতি মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর রচনারম্ভ ও প্রস্তুতির কাল সম্পর্কে নানাবিধ তারিখ ও তথ্য। এছাড়া জানতে পেরেছি পরিকল্পিত কয়েকটি পুস্তক রচনার কথা। Men I Have Seen ধরণের একটি বাংলা বই 'মনের মানুষ' নাম দিয়ে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, অসংকলিত কবিতাগুলি সংকলন করতে চেয়েছিলেন 'প্রসূন প্রক্ষেপ' নাম দিয়ে, অন্যান্য প্রবন্ধগুলি 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে সংকলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যভাগবত, অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্মভিত্তিক গ্রন্থগুলি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করত। সেকারণে তিনি 'নবভক্তিধর্ম' নামে একটি গ্রন্থরচনার ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন। আমৃত্যু তাঁর সংকল্প ছিল (১৫. ১০. ১৯০১)—'অতঃপর যাহা কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা প্রধানত সাহিত্য রচনাতে দিতে হইবে।' গ্রন্থরচনার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সুষ্ঠু সেবা সম্ভব—এই ছিল এই সাহিত্যপ্রাণ ব্রাহ্মনেতার ধারণা। সেকারণে তাঁর রচিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাশে ধর্মভিত্তিক সাহিত্য স্বমর্যাদায় স্থান পেয়েছে। আসলে তিনি চেয়েছিলেন (১২. ৫. ১৯০৯): 'Literary Work-এর দ্বারা ধর্মভাব বিস্তার' করতে। ধর্ম বলতে তিনি আনুষ্ঠানিক কয়েকটি আচার-সংস্কার-বিধি পালন বা উপাসনার ভাণকে বুঝতেন না। তাঁর জীবনের মর্মমূলে ছিল শুদ্ধ নৈতিকতা। নিজের রচনায় সমালোচনা করতে গিয়ে অথবা অপরের গ্রন্থপাঠের পর সমালোচনা করতে গিয়ে এই নৈতিকতার মানদণ্ডেই বিচার করতেন। নিজ-রচনার একটি সমালোচনা ডায়েরী থেকে এই প্রসঙ্গে তুলে দিচ্ছি। লেখক নিজের লেখাকে কী দৃষ্টিতে দেখেন, তা জানার সুযোগ তো আমাদের সহজে আসে না। ১২. ৭. ১৯০৪ তারিখে শিবনাথ তাঁর প্রস্তূয়মান উপন্যাস 'বিধবার ছেলে' এবং প্রকাশিত উপন্যাস 'যুগান্তর' সম্পর্কে লিখেছেন—'বেড়াইয়া আসিয়া বিধবার ছেলে অনেকটা লিখিলাম। এই বইখানা তাড়াতাড়ি শেষ করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু আমার নায়ক একজন সংস্কারভাবাপন্ন লোক। দেশে যেরূপ

reaction-এর স্রোত চলিয়াছে, তাহাতে এ ভাবাপন্ন নায়কের আকর্ষণ হইবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের মত একটা লোক ইহার মধ্যে থাকিলে ভাল হয়। এমন একটা মানুষ কোথা দিয়া আনি সেই চিন্তা মনে জাগিতেছে। আর একটা কথা আমার Female Characters-গুলি সবই ভাল করিতে যাইতেছি, এটাও কি স্বাভাবিক? বাঁদর মেয়েও তো সমাজে আছে। কিন্তু কেন জানি না, মেয়ে মানুষকে বদ দেখিতে বা অঙ্কিত করিতে আমার ভাল লাগে না। যুগান্তরের মাতঙ্গিনী হতভাগিনীকে বদ করিতে গিয়াও সম্পূর্ণ বদ করিতে পারি নাই। তত wicked নহে যত silly—আমার বোধহয় সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে wickedness তাহাদের মধ্যে বড় কম, তাহারা যে পাপে যায় তাহা silliness-এর জন্য। মনে হইতেছে, দুএকটা বদ মেয়ে মানুষও দিতে হইবে।' আসলে শিবনাথ দেশের যুব-সম্প্রদায়কে টলস্টয়ের চিন্তাধারায় প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে এই প্রকারের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।[১]

বিচিত্র সংবাদ

শিবনাথের এই ডায়েরী নানা চূর্ণ সংবাদে পরিপূর্ণ। এতে শিবনাথের ব্যক্তি-গত জীবন, রুচি ও নৈতিকতার নানা বিচিত্র সংবাদ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

শরীরচর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রভূত। তাঁর স্বাদেশিকতা ভীরু দেশপ্রেমিকের দুর্বল লেখনী সঞ্চার মাত্র ছিল না। ৫৫ বছর বয়সেও তিনি ব্যায়াম করতেন, খালি হাতে নয়, ভারী dumb-bell নিয়ে—'প্রাতে ১০।১৫ মিনিট dumb-bell exercise করিলাম'—১. ৮. ১৯০৩। এমন আরও বহু বছর করেছেন। ২৯. ৯. ১৯০৩ তারিখে তিনি সরলা দেবীর বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠিখেলা দেখে চমৎকৃত হন।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে—বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানে আসমান-জমিন ফারাক থাকলে—তাঁর গভীর আপত্তি থাকত—'একজন ৫০ বৎসরের বুড়ো মদ্দ একটী ১৪ চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালিকার সহিত প্রেম করিতেছে স্মরণ করিলেও আমার হৃৎকম্প হয়। ইহাতে উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক অধোগতি হইয়া থাকে। বালিকার মানসিক পবিত্রতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।'—এমন মন্তব্যটি ৮. ৪. ১৮৮৪ তারিখের।

১৪. ৪. ১৮৮৪ তারিখে তিনি প্রথম জেল দেখেন এবং কয়েকজন কয়েদীকে নানাবিধ প্রশ্নাদি করেন। এই রকম একজন কয়েদী অনেক পরে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, শিবনাথের প্রভাবে তাঁর জীবনে পরবর্তীকালে কি পরিমাণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

Indian Museum পরিদর্শন করেন ৩. ১০. ১৯০৩ তারিখে।

জাপানী রমণীদের তৎকালীন যৌনদুর্বলতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। 'সেখানে licensed prostitution and segregation of prostitutes আছে'—এই সংবাদ শুনে ১৬. ১০. ১৯০৩ শুক্রবার তাঁর নিজের বালিগঞ্জের বাড়ীতে বসে জাপান-প্রত্যাগত বন্ধুবর রমাকান্ত রানার সঙ্গে দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন। মেয়েদের নৈতিক অবনতি তাঁকে বিচলিত করত। সে-কারণে তিনি ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে অভিনয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রথম যুগে তিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হয়ে থিয়েটারের reporter-এর কাজ করতেন। ১৬ই আগস্ট ১৯০৯ তারিখে তিনি দার্জিলিঙে ছিলেন। এখানে আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে বিদেশী অভিনেত্রী Mrs. Christeen এসে কয়েকদিন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয় সম্পর্কে শিবনাথের যে কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলি আমরা শিবনাথের ভাষায় নীচে তুলে দিলাম—'Mrs. Christeen সেখানে (অর্থাৎ আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে) আছেন তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইতে [হইতে] Native Theatres সম্বন্ধে কথা হইল, আমি actress-দের সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলেদের মেশার তীব্র প্রতিবাদ করিলাম। তৎপরে মনে কি এক অদ্ভুত আবেগ আসিল—actress-দিগের একটা home করিয়া stage regenerate [এর] যে একটা idea অনেক [দিন] হইতে মনে আছে, ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে তেমন মেয়ে না পাওয়াতে তাহা কার্যকর করিতে পারিতেছি না বলিয়া আসিতেছি, সে idea-টা Mrs. Christeen-এর মত মেয়ে পাইলে হয়, এইরূপ মনে আসিল।'

পশুপ্রীতি শিবনাথের আবাল্যগুণ। 'মেজবৌ' উপন্যাসের টুনোশালিখ, আত্ম-চরিতের রবার্টকুকুর—যার জন্যে শিবনাথ সদ্যোপরিণীতা বধূকে গৌণ বলে ভেবেছিলেন—তারা তাঁর শিশুসঙ্গী ছিল। বৃদ্ধবয়সেও এই সম্পর্ক আরও বৃদ্ধির কথা লিখেছেন (৩.১০.১৯১১)—'ইতর প্রাণীদের প্রতি দয়ার ভাব···জীবনের এই অবশেষ কালে বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।'—তখন শিবনাথের বয়স ৬৪ বছর।

শিবনাথ ইংলণ্ড গিয়েছিলেন ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। শুধু ইংলণ্ড নয়, আমেরিকা যাবারও ইচ্ছা তিনি বহুদিন ধরে মনে লালন করে এসেছিলেন—বন্ধুবর দুর্গামোহন দাসকে একথা জানিয়েছিলেন। বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিবনাথ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ডায়েরীতে লিখেছেন—'পুরাতন সংকল্প। সংকল্পটা এই জগদীশ্বর যদি অনমুকূল না হন তবে ৩ বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়া থাকিয়া, সেখানকার ধর্মজীবন, রীতিনীতি ও রাজ্যশাসন ও সমাজসংস্কার প্রভৃতির প্রণালী মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া আসিব। তাহা হইলে এখানে আসিয়া অনেক কাজ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে, তাহার পূর্বে আমার সংস্কৃত জ্ঞানটা একবার ঝালাইয়া লওয়া আবশ্যক। এবং এখানকার দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসম্প্রদায় সকলের বিষয় কিছু কিছু জানা কর্তব্য। নিজের ঘরের কাছের কথা না জানিয়া দূরে জানিতে যাওয়া বাতুলের কার্য।…তৎপরে ১৮৮৬ সনের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যাত্রা করা যাইতে পারে।' ১৮৮৪ সালের এই ইচ্ছা ১৮৮৮ সালে রূপায়িত হয়েছিল।

যুবশক্তির সামর্থ্য সম্পর্কে শিবনাথের গভীর আস্থা ছিল। এক সময় তাঁর আহ্বানে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বহু দেশপ্রেমিক ছাত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমেছিলেন—এমনকি কয়েকজন P.R.S. পরীক্ষার্থীও এই দলে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বক্তৃতা শুনে অতি বড় বিরোধীও বশ্যতা স্বীকার করতেন। শিবনাথ এই যুবকদের যথাযথভাবে শিক্ষণ দেওয়ার জন্য দেহচর্চার সঙ্গে মানসিক উন্নতির কথাও ভাবতেন—যেমন রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। পরিণত বয়সেও তিনি ভেবেছিলেন যে, সাহিত্য রচনা ছাড়াও যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষণ দান করে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করতে পারবেন। সে কারণে ২০. ১২. ১৯০১ তারিখের ডায়েরীতে লিখেছেন,—'আমি ভাবিয়া দেখিতেছি আমি এখনও দুই প্রকারে ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করিতে পারি, প্রথম গ্রন্থরচনার দ্বারা, দ্বিতীয় যদি কতকগুলি Young men trained হইতে চায় তাহাদিগকে train করার বিষয়ে সাহায্য করা।'

ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্দলীয় কলহ একসময় চরমে উঠেছিল। আজ পর্যন্ত এই মনোমালিন্য সম্পূর্ণ দূর হয়নি। শিবনাথ একটি বিশিষ্ট সমাজের নেতা হয়েও এই কারণে গভীর মনোবেদনা অনুভব করতেন। সে কারণে পঞ্চাশ বছর বয়সেও

তিনি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা সমঝোতা আনার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রমাণও এই অন্তরঙ্গ দিনলিপিতে উপস্থিত। Koilwar থেকে তাঁর ৫৬তম জন্মদিনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এইভাবে নির্ধারণ করেছেন—'...to act as a peace-maker between conflicting groups.'

সবশেষে 'গুরুবন্দনা' শ্লোকরচনার দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটাব। জীবনের উপান্তে এসে শিবনাথ সারাজীবনে কোন্ কোন্ ব্যক্তির মহৎ-সংস্পর্শে এসে জীবনকে নানাভাবে সফল করে তুলতে পেরেছেন সেকথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। তাঁর মনে হয়েছিল—এই সব মহৎ প্রাণ ব্যক্তিকে প্রতিদিন স্মরণ করলে তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করা যাবে। সে কারণে তিনি তাঁদের নামমালা একটি দীর্ঘ বন্দনা শ্লোকে নিবদ্ধ করেছিলেন। শিবনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। সেজন্য এই তালিকা কেবলমাত্র বঙ্গদেশীয় অথবা ভারতবর্ষীয় মহৎগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বিদেশের বহু মহৎ ব্যক্তিও এতে স্থান পেয়েছেন। এঁদের কয়েকজনের নাম ও গুণাবলী এখানে উল্লেখ করছি—শিবনাথের ভাষায়। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শিবনাথ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যান। এখানে উপাসনার পূর্বে এক নির্জন উদ্যানে এই গুরুবন্দনার সূচনা হয়। প্রথম চার পঙ্‌ক্তিতে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস এবং আনন্দমোহন বসুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। আমরা পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয় উদ্ধার করছি—

দেবেন্দ্র কেশবশ্চৈব বৃদ্ধো রামতনুস্তথা।
রাজনারায়ণঃ সাধুঃ শিবচন্দ্রস্তথৈবচ॥
নবীনো বিনয়াধার দুর্গামোহন এবচ।
আনন্দমোহনো বন্ধু রক্ষৌতে গুরুবে মম॥

এঁরা ব্যতীত পিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার, পিতা 'সত্যবাক্' হরানন্দ, জননী 'সুব্রতা ধর্মধারিণী' গোলকমণি দেবী, 'দৃঢ়ব্রতঃ' মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 'বিধবাবন্ধুঃ' 'কৃপানিধিঃ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'শক্তিসিন্ধো মাতৃভাব সমন্বিত' রামকৃষ্ণ পরমহংসের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বিদেশীগণের মধ্যে আছেন—'বিশ্বাসী বিনয়ী ভক্তো জর্জশ্চ মূলরাহ্বয়ঃ', 'সত্যসন্ধিৎসুঃ' নিউম্যান, 'তত্ত্বদর্শী' জেমস্ মার্টিনো, 'প্রেমিকানন্দ' ফ্রান্সিস কব, 'সাধ্বী' সোফিয়া ডবসন

কলেট '—ইহারা সকলে আমার গুরু, ইহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্মসাধনে মহাশক্তি লাভ করি।' এটির দীর্ঘতম রূপ প্রদত্ত হয়েছিল ১. ৩. ১৯১৪ তারিখে।

আমরাও এই সব পূজ্য ব্যক্তিদের নাম স্মরণ ক'রে ডায়েরীর প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করছি। কোথাও কোথাও ডায়েরীর মূল বক্তব্য রেখেছি, কোথাও বা প্রয়োজনীয় অংশমাত্র উদ্ধার করেছি। আরও বহু প্রসঙ্গ অনালোচিত থেকে গেল। তবে এই প্রসঙ্গগুলি দিয়ে আমরা শিবনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের একটা লিপিচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি। এই প্রয়াস সার্থক হত যদি এই সঙ্গে সমগ্র অংশ প্রকাশ করতাম। এখানে শুধু ভূমিকাটুকু রচনা করা হলো।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. আরও দু'টি প্রসঙ্গ এই ডায়েরী থেকে উদ্ধারযোগ্য ছিল। কিন্তু পূর্বেই এ দু'টি অন্যত্র প্রকাশিত হওয়ায় এই অংশকে আর অপ্রকাশিত ভাবছি না। একটি প্রসঙ্গ, মৃত্যু-সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাধারা—এটি প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান লেখক কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত পাক্ষিক 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকার ৯২ ভাগ, ২২-২৪ সংখ্যায়। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক —শিবনাথ শাস্ত্রী কি কি বই পড়তে ভালবাসতেন। গ্রন্থকীট শিবনাথের এই প্রসঙ্গটিও সবিস্তারে উক্ত পত্রিকার ৯২ ভাগ, ১৩-১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি এই গ্রন্থে সংকলিত হ'ল।

শিবনাথ শাস্ত্রী-লিখিত অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকা

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'-এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই আত্মচরিত রচনার উপাদান হিসাবে ব্যক্তিগত স্মৃতি, চিঠিপত্র সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি গৃহীত হয়েছে। তবে আত্মচরিতের দ্বিতীয়ার্ধ রচনাকালে তিনি নিজের ডায়েরীগুলি থেকেই সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিলেন, অনুমান করি। জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী বলেছেন, তাঁর বাবা ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেন। এই সব ডায়েরীর কিছু কিছু প্রকাশিত, অনেকগুলি আবার অপ্রকাশিত। এই ডায়েরীগুলি ব্যতীত তাঁর স্বহস্ত-লিখিত একটি কুলপঞ্জিকাও আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। অদ্যাবধি এটি অপ্রকাশিত। যেহেতু এটি কুলপঞ্জিকা, সেহেতু এর বিবরণ ব্যক্তিগত এবং বংশগত। তবে 'আত্মচরিত'-এর সূচনার সঙ্গে এই কুলপঞ্জিকার আদ্যাংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। শিবনাথ 'আত্মচরিত' লিখতে আরম্ভ করেন অনুমান ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি। অপ্রকাশিত ডায়েরী এমনই তথ্য সরবরাহ করছে। আর এই কুলপঞ্জিকার সূচনা ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর তারিখে। সেদিক থেকে এটিকে সহজেই আত্মচরিতের খসড়া রচনার উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এখানেই এর সাহিত্যমূল্য। 'আত্মচরিত'-এ অবশ্য ৫ই জুন ১৯০৮ তারিখ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত। কুলপঞ্জিকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের হাতে লেখার শেষ তারিখ ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬। সম্ভবত 'আত্মচরিত' প্রকাশের উদ্যোগের কারণে এর পর আর লেখেন নি।

সূচনায় বলেছি, অদ্যাবধি এটি অপ্রকাশিত। কিছু অনৃতবাদিতা আছে এই উক্তিতে। এখানে প্রদত্ত বংশলতিকাটি পূর্বে আরও দু'জন ব্যক্তি ব্যবহার করেছেন। হেমলতা দেবী করেছেন তাঁর 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত' (১৯২০) নামক গ্রন্থে এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ব্যবহার করেছেন শিবনাথের 'আত্মচরিত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) সম্পাদনাকালে। বর্তমান সম্পাদকও তাঁর 'সাহিত্য সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী' গ্রন্থে একে ব্যবহার করেছেন। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সম্পাদনাকালে কুলপঞ্জিকার আরও একটি অংশ—যেখানে

শিবনাথের বড় ও ছোট পিসিমা এবং পিতৃব্য রামতারণের উল্লেখ আছে—সেটি পাদটীকায় হুবহু উল্লেখ করেছেন। হেমলতা দেবী তাঁর উক্ত জীবনীগ্রন্থে অন্যান্য অংশও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করেছিলেন বলে আমার অনুমান, অন্তত বংশপরিচয় পরিচ্ছেদে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১-এ জানুয়ারি। মৃত্যু হয় ৩১-এ সেপ্টেম্বর ১৯১৯-এ। পিতৃভূমি চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রাম—শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইনের জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনে নেমে যেতে হয়। জন্মস্থান অবশ্য মাতুলালয় চাঙড়িপোতায়—ঐ একই রেলপথের বর্তমান সুভাষনগর স্টেশনের সন্নিকটবর্তী। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত বিষয়ে এম. এ. ও শাস্ত্রী উপাধি পান। সূচনায় কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে প্রধানতঃ এঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৮৭৮)। আজীবন এরই সেবায় ছিলেন নিরত। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য প্রভৃতিরও তিনি একজন সার্থক রচয়িতা। বর্তমান কুলপঞ্জিকায় আমরা তাঁর একটি অন্তরঙ্গ ও স্নেহময় পারিবারিক পরিচয় পাই। কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের কারও কারও পরিচয় পরিশেষে প্রদত্ত হল। এই কুলপঞ্জিকাটি আমি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে পেয়েছি। এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এঁর নাম পাঠক কুলপঞ্জিকার মধ্যে কয়েকবারই পাবেন। বস্তুত এঁকে কেন্দ্র করেই কুলপঞ্জিকাটি আরব্ধ ও লিখিত।

পাঠক আরও লক্ষ্য করবেন, কুলপঞ্জিকাটি তিনটি দিনের বিবরণে পরিপূর্ণ —২৯. ১১. ১৯০২, ২৩. ৮. ১৯০৩ এবং ২৭. ১১. ১৯০৬ তারিখের। অবশ্য শেষ দিনের বিবরণ ২৭-এ নভেম্বর ১৯০৬ তারিখের হলেও শাস্ত্রী মহাশয় এটি সমাপ্ত করেছেন ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখে—স্বাক্ষরের শেষে এই তারিখই লিপিবদ্ধ। কুলপঞ্জিকার মধ্যে ২৩ আগস্টের বিবরণের শেষে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষরের বামপার্শ্বে যে বিবরণটুকু আছে, তা অবন্তী দেবীর লিখিত। সে কারণে মূল পঞ্জিকায় সেটি দিলাম। এই বিবরণের জন্য ১১ নং পাদটীকা লক্ষ্য করতে অনুরোধ করছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার শেষে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সে বিবরণ এখানে দিলাম না অপ্রাসঙ্গিক

হবে ভেবে।

যে খাতায় কুলপঞ্জিকাটি লিখিত সেটি শিবনাথের আদেশমত কিনে এনেছিলেন পুত্র প্রিয়নাথ। এখানে তার উল্লেখ আছে। খাতাটি লাইনটানা লম্বা রেজিস্টার খাতার মতো—পরিমাপ—সাড়ে সাত ইঞ্চি × বারো ইঞ্চি। বাঁধানো। এবারে কুলপঞ্জিকার অনুলিপি নীচে প্রদত্ত হল।

প্রথম পৃষ্ঠা ॥

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং

কুল-পঞ্জিকা।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ ২৯ নভেম্বর। শনিবার হইতে। আরব্ধ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা : [কিছু লেখা নেই]

বংশলতিকা

৪র্থ পৃষ্ঠা : বাৎস গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলোৎপন্ন

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা

রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামেশ্বর বা খাউ বিদ্যালঙ্কার

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

সীতারাম ভট্টাচার্য্য

রাধানাথ ভট্টাচার্য্য

রামজয় ন্যায়ালঙ্কার

রামকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রীহরানন্দ বিদ্যাসাগর

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীরেবতীনাথ ও অমরনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম পৃষ্ঠা : বালিগঞ্জ ২৯ নভেম্বর ১৯০২। আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্তবাবু মধুসূদন রাও মহাশয় গত পরশু ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার তারে সংবাদ দিয়াছেন যে সেই দিন মধ্যাহ্ন ১২টা ৫৮ মিনিটের সময় আমার পুত্র প্রিয়নাথের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বধূমাতা শ্রীমতী অবন্তী দেবী প্রসব হইবার জন্য পিতৃগৃহে

গিয়াছিলেন, সেখানে নিরাপদে পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছেন। আমার আদেশ-ক্রমে প্রিয়নাথ এই খাতাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন : ইহাতে আমাদের বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে।

আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি। আমাদের আদি নিবাস ২৪ পরগণায়, কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব অনুমান ২৮ কি ৩০ মাইল ব্যবধানস্থিত মজীলপুর গ্রামে। এই গ্রাম এক্ষণে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। ঐ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা কোথা হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পরম্পরাতে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে যখন রাজা মানসিংহ যশোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু দত্ত নামে একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ যশোর বা তৎসন্নিকটবর্তী কোনও স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া এই গ্রামে বাস করেন। গ্রামটী গঙ্গার চড়াতে[1] স্থাপিত ছিল। তাহার উত্তর পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এখনও মজীলপুর ও জয়নগর এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে গঙ্গার বাদা বলে : এবং এখনও আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর জল পবিত্র গঙ্গাজল বলিয়া গণ্য হয়। পোর্তুগীজগণ যখন প্রথমে এদেশে আগমন করেন, তখন এই পথে আসিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার শৈশবে আমি শুনিয়াছি যে গ্রামের পূর্বভাগবর্তী খালে মাটির মধ্যে জাহাজের নঙ্গর কাছি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকেতু দত্তের[2] পরিবারগণ এখনও আছেন। তাঁহারা মজীলপুরের দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এরূপ জনশ্রুতি যে চন্দ্রকেতু দত্ত যখন এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তখন সঙ্গে তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতাও এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা কি যশোর হইতে আসিয়াছিলেন, অথবা দাক্ষিণাত্য উৎকল প্রদেশ হইতে আসিয়া চন্দ্রকেতু দত্তের সহিত সম্মিলিত হন, তাহা জানি না। উৎকলে এক শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন তাহাদিগকে ওত্তা বলে। ইহারা উদ্‌গাতা বংশজাত হইবেন।[3] আমরা বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বাৎস গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ এখনও মান্দ্রাজ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং উদ্‌গাতা উপাধি বৈদিক উপাধির বৈদিক প্রক্রিয়া এখনও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে, এই সকল কারণে অনুমান করি তিনি তৈলঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া থাকিবেন।

প্রিয়নাথ শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা হইতে একাদশ পুরুষে অবস্থিত।[4] এই বংশে

চিরদিন সকলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কার্যই করিয়া আসিয়াছেন। [৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক আমাদের গ্রামে, আমাদের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ১০।১২টি টোল চতুষ্পাঠী ছিল; তন্মধ্যে আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের একটী। রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে আমি দেখিয়াছি। আমার বার বৎসর বয়সে অনুমান ১০৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কাল হয়। ইনি বহু বৎসর কলিকাতা সহরে ছিলেন, এবং পীলতাণ্ডার রাধানাথ[৫] মল্লিকের ভবনে কুল পুরোহিতের কাজ করিতেন। শেষ দশায় অন্ধ হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন।

আমার পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কাল হয়। তিনি স্বগ্রামস্থ কাশ্যপ বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ভবনে বিবাহ করেন। আমার পিতামহী লক্ষ্মীদেবী গৌরাঙ্গী, তেজস্বিনী, নির্ভীক ও সত্যবাদিনী নারী ছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল পদসম্ভ্রমে ও গুণগৌরবে অগ্রগণ্য হওয়াতে তিনি কাহাকেও ডরাইতেন না। ১৮৩৩ সালের ঝড় হইয়া সাগর তরঙ্গ উঠিয়া দক্ষিণ দেশ ভাসিয়া যায়। তৎপরেই দক্ষিণ দেশে[৬] বিষম কলেরা রোগ দেখা দেয়। এই রোগ হয় কলেরার প্রথম প্রকাশ। সেই কলেরা রোগ আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে। সেই রোগে এক সপ্তাহ মধ্যে আমার পিতামহ পিতামহী ও প্রপিতামহীর মৃত্যু হয়। তখন বোধহয় আমার পিতা শ্রীহরানন্দ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তশেখর[৭] [এর] বয়স ৬ কি ৭ বৎসর। অনুমান ১৮২৭ সালে তাঁহার জন্ম হয়। পিতামহ পিতামহীর মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ প্রপিতামহ, আমার জ্যেষ্ঠা পিতৃষসা আনন্দময়ী বা বিন্দী, কনিষ্ঠা পিতৃষসা গণেশজননী, আমার পিতা ও আমার পিতৃব্য রামতারণ এই কয়জন সংসারে থাকেন। বড়পিসীর আমার পিসামহাশয় ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হইয়া তিনি পিত্রালয়েই চিরদিন বাস করিতেছিলেন। পিসীকে আর শ্বশুর ঘরে যাইতে হয় নাই। বরং পিসামহাশয় শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ঘরজামাই হইয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। পিসামহাশয় দত্ত বাড়ীতে পূজারি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমার পিতৃব্য রামতারণ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হয়। অনুমান দশ বৎসর বয়সে কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণপূর্ব-কোণবর্তী চাংড়িপোতা গ্রামের ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কন্যা গোলকমণি দেবীর [৭ম পৃষ্ঠা] সহিত আমার পিতার বিবাহ হয়। এই হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺দ্বারকানাথ

বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক। ইঁহাদের বংশও পূর্বে পূর্বে সকল যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্মই চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কখনও বিষয়কর্ম করেন নাই।

গোলকমণি দেবীর গর্ভে ১৮৪৭ সালে ৩১ জানুয়ারি দিবসে আমার জন্ম হয়। ঈশ্বর কৃপায় পিতামাতা এখনও জীবিত আছেন। আমি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র সন্তান। বালককালে উন্মাদিনী নাম্নী আমার এক ভগিনীর মৃত্যু হয়। তৎপরে আমার আর তিন ভগিনী হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে ঠাকুরদাসী, বিলাসিনী ও কুসুমবালা। তিন জনেই এখন জীবিতা আছে। ঠাকুরদাসী এখনও সধবা [,] পুত্রকন্যা অনেকগুলি। বিলাসিনী ও কুসুম বিধবা [,] দুইজনেরই দুইটি করিয়া পুত্র ও এক একটী কন্যা।

অনুমান ১৮৫৯ সালে চাঙড়িপোতার সন্নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামের ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথমা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত আমার প্রথম পরিণয় হয়। প্রসন্নময়ীর গর্ভে সর্ব জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা; তৎপরে তরঙ্গিণী, তৎপরে প্রিয়নাথ, তৎপরে সুহাসিনী জন্মিয়াছে। সরোজিনী নামে আর একটি কন্যা ছিল, সে অকালে গত হইয়াছে।

হেমলতা—১৮৬৮ সালের ১১ই আষাঢ়।
তরঙ্গিণী—১৮৭০ সালের ৮ই শ্রাবণ।
প্রিয়নাথ—১৮৭১ সালের ১৪ই আষাঢ়—
সুহাসিনী—১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর।

কোনও পারিবারিক বিবাদের জন্য আমার পিতামাতা প্রসন্নময়ীর জীবদ্দশাতেই অনুমান ১৮৬৫ সালে আমাকে আবার বিবাহ দেন। এবারে বর্ধমান জেলায় দেপুর নামক গ্রামের ৺অভয়াচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়। বিরাজমোহিনীর সন্তানাদি হয় নাই।

আমি শৈশবে গ্রামের পাঠশালা ও স্কুলে পড়িয়া ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় আসি। আসিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করি। আমার বড় মামা ও আমার পিতা এ কালেজেই পড়িয়া উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। আমার পিতা ঐ কালেজ হইতেই বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭২ সালে আমি এম-এ, ও শাস্ত্রী উপাধি পাইয়া কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হই। ১৮৭৩ সালে আমার মাতুলের

আদেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি ইংরাজী স্কুলের সেক্রেটারি ও হেডমাষ্টার হইয়া যাই। [৮ম পৃষ্ঠা] ১৮৭৪ সালে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী ভবানীপুর নামক স্থানের সাউথ সুবার্বাণ স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসি। সেখান হইতে ১৮৭৬ সালে কলিকাতা হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত ও Translation মাষ্টার হইয়া যাই। ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মধর্ম প্রচারে আপনাকে অর্পণ করি।

১৮৬৯ সালে আমি স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস ১৮৬৫ সালেই জন্মিয়াছিল। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই আমার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছা জন্মে। ঐ কার্যে এখনও আছি।

১৯০১ সালের এপ্রেল মাসে কটকের সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম মধুসূদন রাও মহাশয়ের কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে প্রিয়-নাথের পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

আমার তিন কন্যারই বিবাহ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা হেমলতার কলিকাতা উপ-নগরবর্তী খিদিরপুর নামক স্থানের ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইনি কায়স্থ বংশজ। মধ্যমা তরঙ্গিণী বা তুলীর যশোর জিলাস্থ বাঘআঁচড়া গ্রামের পিরালী বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহিকের সহিত বিবাহ হইয়াছে; তৃতীয়া সুহাসিনীর নদীয়া জেলাস্থ আসুদীয়া গ্রামনিবাসী কৃষ্ণলাল ঘোষের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইহারা তিনজনেই সৎলোক, ও তিনজনেই জীবিত। ১৯০১ সালের ৩রা জুন দিবসে প্রসন্নময়ী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি বহু বৎসর বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া হস্তবিস্ফোটক হইয়া সেই রোগেই মারা যান।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রি)[৯]

[৯ম পৃষ্ঠা] বালীগঞ্জ—২৩ আগষ্ট ১৯০৩। ৬ই ভাদ্র ১৩১০।[১০]

অদ্য প্রিয়নাথের নবজাত পুত্রের নামকরণ হইল। রেবতীনাথ ও অমরনাথ দুই নাম রাখা হইল। ইহার কারণ বাবা যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহাতে রাশি নাম রেবতীনাথ উঠিয়াছে, মা, অমরনাথ নাম পছন্দ করিয়াছেন। তাই দুই নামই রাখা হইল। আমার বন্ধু চণ্ডীচরণ সেন, আচার্যের কার্য করিলেন।

উপাসনাস্থলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়নাথ ও বধূমাতা আপনাদের পরিচিত ব্যক্তিদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার আত্মীয় দেখিয়া নিমন্ত্রণ করিতে গেলে সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের লোককে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, সুতরাং তাহা করা যায় নাই। মাতা ঠাকুরাণী গড়কল্যা বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। তিনি কিছুদিন এখানে থাকিবেন। তিনি খোকাকে দেখিয়া টাকা, সোনা, মুক্তা প্রভৃতি দিয়াছেন। বাবা অগ্রে দেখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়া ২ দুই টাকা দিয়াছিলেন।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী)[১১]

১৯০৬। ২৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অমরনাথের জন্মদিনের বিশেষ উপাসনা হইল এবং তাহার বিদ্যারম্ভ করান গেল। সায়ংকালে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া অমরনাথের কর আমার করের মধ্যে লইয়া তাহাকে 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' শিখাইয়া ও তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়া "ব্রহ্ম কৃপাহি" শিখাইলাম। হেমলতার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিদ্যারম্ভও ঐ প্রকারে করান গেল। তৎপরে ছেলেরা সকলে একত্রে আহার ও আনন্দ করিল। বর্তমানে আমার দশটী নাতি নাতনী (১) বিজলী-বিহারী (হেমের জ্যেষ্ঠ পুত্র) (২) বিনয়বিহারী (হেমের দ্বিতীয় পুত্র) (৩) বীণাপাণি (হেমের প্রথমা কন্যা) (৪) ইলা (হেমের দ্বিতীয় কন্যা) (৫) মীরা (হেমের তৃতীয় কন্যা) (৬) করুণা (তরঙ্গিণীর কন্যা) (৭) কুহ (সুহাসিনীর প্রথমা কন্যা) (৮) সাধু (সুহাসিনীর প্রথম পুত্র) (৯) নন্দ (সুহাসিনীর কনিষ্ঠ পুত্র) (১০) অমরনাথ (প্রিয়নাথের পুত্র)

অমরনাথের বিকাশোন্মুখ চরিত্রের যে যে লক্ষণের আভাসগুলি পাওয়া যাইতেছে[১২] তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতেছে।

> এখন যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে দেখিতেছি, ছেলেটি একগুঁয়ে যেটা ধরে সেটা সহজে ছাড়ে না; দ্বিতীয় অসহিষ্ণু অর্থাৎ ইহার ইচ্ছাকে বাধা দিলে সহ্য করে না; (৩য়) রাগী, যখন কোনও কারণে কুপিত হয় তখন যেন সহজে সংবরণ করিতে পারে না; যাকে সম্মুখে

[১০ম পৃষ্ঠা] পায় মারিতে প্রবৃত্ত হয়; (৪র্থ) আত্মাদর বিলক্ষণ প্রবল, একটী আর্দালের নিকট যাইতে বলিয়াছিল সেটী তুলিয়া আমার পাতের নিকট দিয়া উহাকে উঠিয়া আমার কাছে আসিতে বলা হইল, কখনই আসিবে না, আমাকে

অন্ত লণ্ঠন তুলিয়া লওয়াতে আপনাকে অপমানিত বোধ করিল। (৫) বাঙ্গালায়ে যে এতদিন থাকিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কাহারও নাম করে না, যেন out of sight out of mind (৬) নিজের জিনিষ কাহাকেও দিতে চায় না, অন্যের জিনিষ লইতে চায় (৭ম) আপনার জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

১লা ডিসেম্বর ১৯০৬[১৩]

কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা ও চন্দ্রকেতু দত্ত সম্পর্কে কুলপঞ্জিকায় যে তথ্য দেওয়া আছে, তার অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় না। যেটুকু অন্যত্র প্রদত্ত আছে, তাও অনুমানের উপর রচিত—কোনক্রমেই নির্ভরযোগ্য নয়। চন্দ্রকেতু দত্ত-এর বংশধরেরা আজও মজিলপুরে বাস করছেন। বস্তুত, এখানের সংস্কৃতি এই দত্ত পরিবারেরই সৃষ্টি।

রামজয় ন্যায়ালঙ্কারকে শিবনাথ বাল্যকালে দেখেছেন। ১০৩ বছর বয়সে এঁর যখন মৃত্যু হয় তখন শিবনাথের বয়স বারো। এ সময়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর ও উজ্জ্বল। এঁর ধর্মপ্রবণতা লক্ষ্য করেই শিবনাথজননী গোলকমণি অন্যত্র দীক্ষা না নিয়ে এঁর কাছেই দীক্ষা নেন। পত্নী ছিলেন সুশীলা দেবী।

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য। কুলপঞ্জিকায় পাঠক লক্ষ্য করবেন বংশলতিকায় পিতার নামের পর বিদ্যাসাগর উপাধি লিখলেও মধ্যে দুবার সিদ্ধান্তশেখর লিখেছেন। অনুমান করি শেষোক্ত উপাধিতেও তিনি ভূষিত ছিলেন। তবে ইনি তাঁর গৌরবময় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত নিজেও 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ছিলেন ভূষিত। একগুঁয়ে এই ব্যক্তিটির সত্যনিষ্ঠা ছিল প্রবাদতুল্য। পেশা শিক্ষকতা, স্ত্রীশিক্ষায় ছিলেন উৎসাহী। সাহিত্যে ছিল গভীর আগ্রহ। তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে 'নলোপাখ্যান' বিখ্যাত। পুত্রকে ধর্মান্তরের কারণে ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ সতেরো বছর পর পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন হয়। জন্ম আনুমানিক ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে, শিবনাথের মৃত্যুর পর (১৯১৯) ইনি মারা যান। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য শিবনাথের বাল্যকালে মারা যান।

প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য—শিবনাথের প্রথম সন্তান ও একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৭১।

মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। ইনিও পিতার স্থায় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। শিবনাথের 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের অপ্রকাশিত খসড়া অবলম্বনে 'রমাকান্ত' উপন্যাস সম্পাদনা করেন এবং এর শেষ পরিচ্ছেদটি (উনিশ-সংখ্যক) নিজে রচনা করেন। মৃত্যু ১৯৪২।

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য—এঁর জন্ম হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। পিতা প্রিয়নাথের মতই একমাত্র পুত্র। মাতা উড়িষ্যার ভক্তকবি মধুসূদন রাও-এর তৃতীয়া কন্যা অবন্তী দেবী। শিবনাথের দ্বিতীয় পত্নী বিধবা নিঃসন্তান বিরাজমোহিনী এঁকে প্রভূত স্নেহে লালন করেন। শিবনাথ কুলপঞ্জিকার শেষাংশে এঁর শৈশব-লক্ষণ সম্পর্কে যে-সব মতামত প্রকাশ করেছেন, তার সারবত্তা ইনিই বিচারে সমর্থ। বর্তমান সম্পাদক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারগ। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই 'কুলপঞ্জিকাটি' পেয়েছি তাঁরই সৌজন্যে। তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ করে এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

মধুসূদন রাও—উড়িষ্যার 'ভক্তকবি' নামে পরিচিত। জন্ম ১৮৫৩, মৃত্যু ১৯১২। 'ছন্দোমালা' (দুই খণ্ড), 'কুসুমাঞ্জলি', 'বসন্তসখা', 'উৎকলগাথা', 'শোকশ্লোক', 'সঙ্গীতমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। হরানন্দ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। হরানন্দ এঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। প্রথম সন্তান বাসন্তী দেবীর সঙ্গে প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষা-বৈজ্ঞানিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বিবাহ দেন। দ্বিতীয় সন্তান ডাঃ জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে শিশু-সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুপরিচিতা সাহিত্যিক সুখলতা দেবীর (পরে রাও) বিবাহ হয়। তৃতীয় সন্তান অবন্তী দেবী, ডাকনাম কৃষ্ণা। জন্ম ১৮৮১। শ্বশুর শিবনাথের বহু অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করেন। 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'র সম্পাদিকা ও 'ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ' (১৩৭০) গ্রন্থের রচয়িত্রী হিসাবে খ্যাত। নবম সন্তান সুকান্ত রাও (১৮৯৬)-এর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্র করুণার (কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত, শিবনাথের দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিণীর কন্যা, মৃত্যু ১৯৫১) বিবাহ হয়।

হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন—সংস্কৃতে অসাধারণ পণ্ডিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ। সে যুগের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদনায় ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে সহায়তা করতেন। বস্তুত, হরচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত দুজনেই হাতিবাগানের কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের সুযোগ্য পুত্র। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সমধিক খ্যাত। নির্ভীক এই সংবাদিক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'সোমপ্রকাশ' দীর্ঘ কুড়ি বছর প্রকাশিত হয়। শিবনাথ তাঁর এই মাতুলের কাছ থেকেই সাহিত্য-জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে সর্বাধিক স্নেহ পেয়ে এসেছেন। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনেই শিবনাথের সম্পাদক-জীবনের প্রথম সূচনা হয়।

গোলকমণি দেবী—অসাধারণ আত্মমর্যাদা-সম্পন্না নারী। পুত্রকে প্রাণাধিক স্নেহ করতেন। পুত্রের ধর্মান্তরে কষ্ট পেলেও পুত্রের মঙ্গলার্থে একবার বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছিলেন। সুরুচি ও শিক্ষার প্রথম পাঠ এই অসামান্যা সুন্দরী মাতার কাছ থেকে শিবনাথ পেয়েছিলেন।

উন্মাদিনী—শিবনাথের অব্যবহিত পরের বোন। তাঁর চেয়ে ছ'বছরের ছোট। অত্যন্ত সুশ্রী এই বোনটিকে শিবনাথ অসম্ভব ভালবাসতেন। এঁর মৃত্যু শিবনাথের মনে গভীর দাগ কাটে। লিচু খেয়ে এর মৃত্যু হয় বাল্যকালেই।

কেশবচন্দ্র সেন—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নববিধানের প্রবর্তক। জন্ম—১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৮৪। পিতা প্যারীমোহন সেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে অভিষিক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ উপাধি দেন 'ব্রহ্মানন্দ'। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপন করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী এঁর কাছে দীক্ষিত হন ব্রাহ্মধর্মে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড যান। এঁর বক্তৃতায় ছিল মোহিনী শক্তি, অন্যস্থানে ছিল রাষ্ট্রনেতার সামর্থ্য। বহু গ্রন্থের রচয়িতা হলেও 'জীবন বেদ'-এর আধ্যাত্মিক ইতিহাস অনবদ্য রচনা।

চণ্ডীচরণ সেন—শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু ও ব্রাহ্মনেতা। জীবৎকাল ১৮৪৫—১৯০৬। মহিলাকবি কামিনী রায় এঁর কন্যা। 'Uncle Tom's Cabin'-এর বঙ্গানুবাদকর্তা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রবল উৎসাহ ছিল। 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'ঝান্সীর রাণী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। 'মহারাজ নন্দকুমার' লিখে ইনি সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেম এঁর রচনার মূল সুর। অমরনাথের নাম-করণ উৎসবে ইনি আচার্যের কার্য নির্বাহ করেন।

ঠাকুরদাসী, বিলাসিনী ও কুসুমবালা—শিবনাথের তিন ভগিনী। এঁরা

উল্লাসিনীর পর জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের বিশিষ্ট কোন পরিচয় নেই।

প্রসন্নময়ী দেবী—শিবনাথের প্রথমা পত্নী। ইনি বাগ্‌দত্তা ছিলেন। শিবনাথের জন্মস্থান ও মাতুলালয় চাংড়িপোতার সন্নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। প্রথমে শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও পরে শিবনাথ তাঁকে যোগ্য মর্যাদায় নিয়ে আসেন। শিবনাথের পুত্রকন্যারা এঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপত্নী প্রসন্নময়ীর উদার সহযোগিতাই শিবনাথকে গৃহ ও সমাজজীবনে এত উন্নত করেছিল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন বহুমূত্র ও অঙ্গুলিক্ষত রোগে এঁর মৃত্যু হয়।

বিরাজমোহিনী দেবী—শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী, বর্ধমান জেলার দেপুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। আজীবন ব্রহ্মচারিণী, সন্তানহীনা ধর্মপত্নী। শিবনাথের মৃত্যুর পর এঁর মৃত্যু হয়।

শিবনাথের পুত্রকন্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস'-রচয়িত্রী হিসাবে এককালে শিক্ষাসমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের আষাঢ় মাসে মজিলপুরে এঁর জন্ম হয়। বিবাহ হয় বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকারের সঙ্গে। আগে বলা হয়েছে শিবনাথের মৃত্যুর পরবৎসর এঁর লেখা 'শিবনাথ-জীবনী' প্রকাশিত হয় ও সমাদর লাভ করে।

পুত্র প্রিয়নাথের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। ২য়া কন্যা তরঙ্গিণীর বিবাহ হয় বাঘআঁচড়া নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবনাথের ইংলণ্ড যাত্রার ঠিক দু'দিন পূর্বে—১৩. ৪. ১৮৮৮ তারিখে। সরোজিনী নামে তাঁর এক কন্যার বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। সম্ভবত ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে মুঙ্গেরে। এঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে শিবনাথ 'নবশোক' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত আছে। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর মৃত্যুও শিবনাথের জীবৎকালেই ঘটে (১৫. ১১. ১৯০৬)।

পৌত্র অমরনাথের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীগণের মধ্যে হেমলতা দেবীর পুত্রকন্যারাই উল্লেখযোগ্য। হেমলতা দেবীর দুই পুত্র, তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ ডঃ বিজলীবিহারী সরকার ডি. এস্. সি, এফ. আর. এস্, ই (এডিনবরা)। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইনি পরিচিত। এঁর

বিবাহ হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, প্রত্নতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে। একমাত্র পুত্র বিপ্লববিহারী একুশ বছর বয়সে মারা যান। তিন কন্যা তপতী, অদিতি ও রেবতী। বিজলীবিহারী কিছুদিন আগে পরলোকগমন করেছেন।

দ্বিতীয় দৌহিত্র বিনয়বিহারী। ইনিও পরলোকগত। জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী বীণাপাণির বিবাহ হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী স্বর্ণপ্রভা বসুর দ্বিতীয় সন্তান ব্যারিস্টার সুরেশমোহন বসুর সঙ্গে। দ্বিতীয়া দৌহিত্রী ইলা স্বামীর নামেই পরিচিত। এঁর স্বামী স্বনামখ্যাত অমলচন্দ্র হোম পরলোকগমন করেছেন।

কনিষ্ঠা দৌহিত্রী, শ্রীমতী মীরা সান্যাল—প্রয়াত হিরণকুমার সান্যালের পত্নী।

অন্যান্য যাঁদের পরিচয় দিলাম না, তাঁরা এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য নন। এখানেই কুলপঞ্জিকার সম্পাদনা সমাপ্ত হ'ল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. এখানে 'গঙ্গার চড়াতে' শব্দদ্বয়ের পূর্বে শাস্ত্রী মহাশয় 'লিখেছিলেন 'দ্বাপের মধ্যে ছিল' ' পরে এটিকে কেটে 'গঙ্গার চড়াতে' বাক্যাংশটি লেখেন।

২. এই স্তবক আরম্ভের পূর্বে লেখা ছিল 'বোধ হয় প্রিয়না…' শব্দনিচয়। পরে কাটা হয়েছে।

৩. পূর্ববর্তী পংক্তির পরে '⁄'—তোলা চিহ্ন দ্বারা নির্দেশের পর পরবর্তী পংক্তির মধ্যে বাক্যটি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত।

৪ 'হইবে'—কাটা।

৫ 'রাধানাথ'-এর পূর্বে লিখেছিলেন 'দ্বারকানাথ'। পরে কেটে দিয়ে 'রাধানাথ' লিখেছেন।

৬. 'দক্ষিণ দেশে' শব্দদ্বয় পরে (⁄)—তোলা চিহ্নদ্বারা লিখিত।

৭. আগে লিখেছিলেন 'বিদ্যাসাগর।' পরে কেটে দিয়ে উপরে 'সিদ্ধান্তশেখর' লিখেছেন। সম্ভবত অনবধানবশত ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নযুক্ত 'শেখরের' শব্দ না লিখে 'শেখর' লিখেছেন। অথচ এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা জানি তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত।

৮. সাত-সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৯. প্রথম দিনের লেখার সমাপ্তি এই বাম পৃষ্ঠাতেই। এই পৃষ্ঠার কিছুটা অংশ সাদা বাকী প'ড়ে আছে।

১০. অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবস—ভাদ্রোৎসবের দিন। প্রায় ন'মাস পর পুনরায় লেখা আরম্ভ।

১১. এই স্বাক্ষরের বামপার্শ্বে যে সাদা জায়গা ছিল সেখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে শিবনাথের পুত্রবধূ অবলা দেবী চার পঙ্‌ক্তিতে নিম্নোক্ত বিবরণ লিখে দিয়েছেন .

"১৯০৪। ১৫ই নভেম্বর, ৪১ নম্বর পদ্মপুকুর রোডের (বালিগঞ্জ) বাড়ীতে মহাশয়ের মৃত্যু হয়। সে সময় শ্বশুর মহাশয়, ছোট মা ও আমি/উপস্থিত ছিলাম না। মৃত্যুর পরদিন শ্বশুর মহাশয়

ও ছোট মা আসিয়া পৌঁছেন।/ তিনটি অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া সুহাসিনী চলিয়া গিয়াছেন। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। অবন্তী দেবী।"

১২. এই শব্দটির পর থেকে নবম পৃষ্ঠার সমাপ্তি পর্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয় খাতার পরিসরের দক্ষিণার্ধে সব স্তম্ভাকারে লিখে গেছেন।

১৩. শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের হাতে লেখা এখানেই শেষ হয়েছে। পরের পৃষ্ঠাগুলি পরিবারের অন্যান্য জনের লেখা। শেষ দিনের লেখার পরেও পণ্ডিত শাস্ত্রী আরও প্রায় তেরো বছর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে 'আত্মচরিত' রচনা করেছেন। কিন্তু এই খাতায় আর কিছু লেখেন নি।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিনাম

প্র. শি খা-৯

গ্রন্থনাম